সোনালী দিনের সন্ধানে

শাসনতন্ত্রে প্রতিটি নাগরিকের অন্ন বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা ও শিক্ষার অধিকার চাই

ডাইরেক্টর
ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব্ জুসে আইডিয়া, জাপান

ঢাকা—বাংলাদেশ

সোনালী দিনের সন্ধানে

শাসনতন্ত্রে প্রতিটি নাগরিকের অন্ন বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা ও শিক্ষার অধিকার চাই

গরীব নেওয়াজ

এডভোকেট

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ পিপলস্ লীগ (গণদল)

প্রেসিডেন্ট

বাংলাদেশ আত্ম–প্রত্যয় গবেষণা কেন্দ্র

ডাইরেক্টর

ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব্ জুসে আইডিয়া, জাপান

ঢাকা–বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রকাশক
নূর মোহাম্মদ খান
৫১/১২ জনসন রোড (দোতালা)
ঢাকা–১১০০
ফোনঃ ২৪০২৪০

প্রথম প্রকাশ
কার্তিক–১৪০০
নভেম্বর–১৯৯৩

তত্ত্বাবধায়নে
আব্দুর রব বিক্রমপুরী
জোবায়দা পারভিন, এডভোকেট

সহযোগীতায়
সিদ্দিকুর রহমান হাজরা, নূরুন্নবী, এম. এ. আজিজ, হারুন-অর-রশিদ মিয়া, নির্মল কুমার বাগ, নজরুল ইসলাম, মাকসুদা আকতার এডভোকেট, মোঃ মজিবউল্লাহ, ফৌজিয়া বেগম, রকিব নেওয়াজ শেখর

অক্ষর সংযোজন
বুক সোসাইটি কম্পিউটারস্
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

মূল্য
সুলভ– ত্রিশ টাকা মাত্র
শোভন– পঞ্চাশ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

লেখকের বই

(১) গণশাসন (জাতীয় জীবনের নতুন দিকদর্শন)

(২) বৈদেশিক সাহায্য–বহুজাতিক সংস্থা এবং তৃতীয় বিশ্ব ও বাংলাদেশ

(৩) Politics Truly for the People

(৪) Path to Independence, Progress and Democracy (*Thesis on Establishment of a Democratic form of Government*)

(৫) Quintessence of Juche Idea and the Task for Implementing Juche

(৬) সোনালী দিনের সন্ধানে

(৭) রক্ত কথা কয় (প্রকাশের পথে)

(৮) Dialectical-Materialism and Juche (Under Publication)

www.pathagar.com

আসুন আমরা সবাই মিলে

গ
ণ
শা
স
ন

প্রতিষ্ঠা ক'রে প্রতিটি নাগরিকের জন্য
অন্ন বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা ও শিক্ষার
শাসনতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করি

www.pathagar.com

উপস্থাপনা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিকতার নিগড় হতে অধিকাংশ কলোনী রাষ্ট্র স্বাধীনতা অর্জন করলেও তারা আজও না পেরেছে তাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে না পেরেছে তাদের জনগণকে শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তি দিতে। দু'একটি দেশ উন্নতি লাভ করছে বলে প্রতীয়মান হলেও আসলে সে দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ কলোনীতে পরিণত হয়েছে, অন্যদিকে তারা তাদের জনগণের মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণেও নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এদিক দিয়ে উত্তর কোরিয়া এক ব্যতিক্রম। উত্তর কোরিয়া নিজপায়ে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হয়েছে এবং তার জনগণের মৌলিক চাহিদাগুলি মিটিয়েছে সুচারুভাবে তা নয়, মার্কিনী হামলার মুখে নিজেকে রক্ষা করার মত এক শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও সে গড়ে তুলেছে।

কোরিয়া সফর শেষে সে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি ও অন্যান্য অবস্থা বর্ণনায় "Politics Truly for the People" নামে আমি একটি বই লিখেছি। কোরিয়ার অভিজ্ঞতা সামনে রেখে আমাদের বাস্তবতায় আমাদের দেশ কিভাবে স্বাবলম্বী ক'রে গড়ে তোলা যায়, জনগণের মৌলিক চাহিদাগুলি কিভাবে মিটান যায়, দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব কিভাবে রক্ষা করা যায় তা নির্ধারণের লক্ষ্যেই আমার এ লেখা। এই লেখার শুরুতে কোরিয়া সম্পর্কে মোটামুটি কিছু তথ্য তুলে ধরা প্রয়োজন মনে ক'রে কোরিয়া সম্পর্কে নিম্নে কিছু তথ্য ও বক্তব্য তুলে ধরলাম।

কোরিয়া ছিল একটি অত্যন্ত পশ্চাৎপদ দেশ। আমরা যেমন বৃটিশ ও পাকিস্তানী উপনিবেশিকতার জালে আবদ্ধ হয়েছিলাম, কোরিয়া তেমনি জাপানী সাম্রাজ্যবাদের নিকট তার স্বাধীনতা হারিয়েছিল। সে সময় কোরিয়ার প্রগতিশীল রাজনীতির ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারক বাহক রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলি ছিল বহু ধারায় বিভক্ত, সর্বত্র তারা আত্মকলহে লিপ্ত ছিল এবং তাদের চিন্তা-চেতনা পরাশ্রয়ীবাদ ও গোঁড়ামীতে আচ্ছন্ন ছিল। এ ধরনের কয়েকটি গ্রুপের নাম হচ্ছে টুইস-ডে গ্রুপ, সান-ডে গ্রুপ, এম এল গ্রুপ ইত্যাদি। যারা কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকতার স্বীকৃতির জন্য সাংহাইতে গিয়ে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকত। কোরিয়ার জনগণের মহান নেতা কমরেড কিম ইল সুং তখন বল্লেন "আমাদের স্বাধীনতা ও জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের সংগ্রাম কারো দয়া বা স্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল নয়, আমাদের নিজস্ব শক্তি ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের নিজস্ব সম্পদের উপর নির্ভর ক'রে আমাদের চলার পথ তৈরি করতে হবে, পরের দান-দক্ষিণায় নয়।"

কমরেড কিম ইল সুং ১৯২৬ সালে ''সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক ইউনিয়ন"("Down with Imperialism Union") গঠন করেন। এই ইউনিয়ন দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়যুক্ত হওয়ার এবং কোরিয়ার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক মুক্তির কর্মসূচী গ্রহণ করে। তিনি ১৯২৭ সালে কোরিয়ার "যুব কমিউনিষ্ট লীগ'' গঠনের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মকান্ডকে আরো সংহত করেন। এরপর তিনি জাপ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন গ্রহণ ক'রে নিজস্ব বাহিনী গড়ে তোলেন। ১৯৩৬ সনে তিনি জাপ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্য "পিতৃভূমি পুনরুদ্ধার সমিতি'' গঠন করেন। তাঁর বিপ্লবী বাহিনীকে দিনের পর দিন বনে জঙ্গলে তৃণমূল ও গাছের ছাল খেয়ে খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাতে হয়েছে। জাপানী

www.pathagar.com

উপনিবেশিক শাসনের নিগড়ে আবদ্ধ স্বদেশবাসীর আর্তনাদের কথা চিন্তা ক'রে তিনি জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের পরাজিত করতে ১৫ বছর নিরলস যুদ্ধ করেন এবং জাতীয় পুনর্জাগরণের পথ খুলে দেন।

কমরেড কিম ইল সুং ১৯২০ দশক থেকে ১৯৩০ দশক পর্যন্ত দার্শনিক নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত এক নতুন ভাবধারা অগ্রসর ক'রে এগিয়ে নিয়ে যান। যা হচ্ছে জুচে ভাবধারা। এর মূল কথা হলো মানুষ সব কিছুর প্রভু এবং মানুষ সবকিছু নির্ধারণ করে। মানুষ সবকিছু নির্ধারণ করে অর্থ হচ্ছে যে, মানুষ সমাজ ও তার ভাগ্য নির্ধারণে নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। মানুষ বিশ্বের প্রভু এবং বিশ্ব পরিবর্তনে মূল ভূমিকা পালন করে এবং সে তার নিজ ভাগ্য গড়ার জন্য নিজেই দায়ী এবং তা গড়ার ক্ষমতা তার রয়েছে। স্বাধীনতার আকাঙ্খা, সৃজনশীলতা এবং সচেতনতা হচ্ছে মানুষের সামাজিক গুণাবলী। স্বাধীনতার আকাঙ্খা হচ্ছে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, সৃজনশীলতা মানুষের সংগ্রামের ধারাকে নির্ধারণ করে এবং সচেতনতা মানুষকে বিজয় অর্জনে প্রেরণা ও শক্তি যোগায়।

পরমুখাপেক্ষী নীতি ত্যাগ ক'রে স্বাধীন অবস্থান গ্রহণ করার কারণে কোরিয়ার জনগণ প্রেসিডেন্ট কিম ইল সুং এর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং জাপানীদের হটিয়ে ১৯৪৫ সনে স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জিত হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশের দক্ষিণাংশ দখল ক'রে নেয় এবং ১৯৫০ সনে কোরিয়ার জনগণের উপর এক ভয়াবহ যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়—যা কোরিয়া যুদ্ধ নামে পরিচিত। সে যুদ্ধ এতই ভয়ানক ছিল যে তার বর্ণনা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। লক্ষ লক্ষ বোমা ফেলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার তাবেদার বাহিনী এক ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠে। উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়াং ইয়াং যার লোকসংখ্যা তখন ছিল ৪ লক্ষ, সেখানে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার বোমা ফেলা হয়। সমস্ত শিল্প কল কারখানা ধ্বংস হয়ে যায়। এমনকি চাষাবাদের হাল-বলদও বোমার আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। ঘর-বাড়ী সব ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু কোরিয়ার জনগণ, প্রেসিডেন্ট কিম ইল সুং এর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অসীম বীরত্বের সাথে লড়াই ক'রে চলে। যার ফলে ১৯৫৩ সনে আক্রমণকারী শক্তি সন্ধি করতে বাধ্য হয়। কোরিয়া যুদ্ধের পর একজন মার্কিন কূটনীতিক বলেছিলেন, "কোরিয়া ১০০ বছরেও নিজ পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হবে না"। কিন্তু শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে মাত্র তিন বছরের মধ্যে উত্তর কোরিয়া তার পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করে। ১৪ বৎসরের মধ্যে শিল্পায়নের কাজ শেষ করে—যা করতে পশ্চিমা দেশগুলির ১০০ থেকে ২০০ বৎসর লেগেছিল। কোরিয়া আজ যে কোন উন্নত দেশের সমকক্ষ এবং অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে কেউ তাকে সহসা পর্যুদস্ত করতে পারবে না। দক্ষিণ কোরিয়াও অনেক চোখ ধাঁধানো উন্নতি করেছে। তবে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে এর গুণগত পার্থক্য হচ্ছে যে উত্তর কোরিয়ার জনগণ প্রেসিডেন্ট কিম ইল সুং এর নেতৃত্বে নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে, নিজের সম্পদ ব্যবহার ক'রে নিজস্ব মেধা ও শক্তি দিয়ে নিজ দেশ গড়েছে। অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়া হাজার হাজার বিলিয়ন ডলার বিদেশের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তার দেশ গড়েছে। সে যুক্তরাষ্ট্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের একটি লেজুড় দেশ হয়ে পড়েছে। নিজের পায়ের উপর দাঁড়ানোর কোন শক্তি দক্ষিণ কোরিয়ার নেই। এমনকি নিজের রক্ষা ব্যবস্থায় অর্থাৎ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও সে যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। নিজেকে রক্ষা করার কোন ক্ষমতা তার নেই। সেখানে প্রায় ৫০ হাজার আমেরিকান সৈন্য স্থায়ীভাবে অবস্থান করছে। কোরিয়া ভ্রমণ করার সময় সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে আমি নিজ চোখে বহু আমেরিকান সৈন্য

www.pathagar.com

দেখে এসেছি। দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রায় এক হাজার আণবিক অস্ত্র মোতায়েন করা হয়েছে। প্রায়ই যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ সামরিক মহড়া করা হয়। যার নাম 'টিম স্পীট'। বলা হয় এসব উত্তর কোরিয়ার সামরিক শক্তিকে মোকাবেলা করার জন্যই করা হয়েছে। অর্থাৎ দক্ষিণ কোরিয়া অর্থনৈতিক এবং সামরিক কোনদিক দিয়েই উত্তর কোরিয়ার সমকক্ষ নয়।

উত্তর কোরিয়া শুধু যে নিজের দেশকে অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করেছে তা নয়। সে তার জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের সমস্যাগুলিও সমাধান করেছে অত্যন্ত সুচারুভাবে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার গুণগত পার্থক্য হচ্ছে যে উত্তর কোরিয়ায় কেউ না খেয়ে থাকে না, সেখানে কেউ ভিক্ষার হাত পাতে না, সেখানে কেউ অশিক্ষিত বা গৃহহীন নেই, কর্মহীন-বেকার কেউ সেখানে নেই। সে দেশে চোর-ডাকাত, তস্কর, লুটেরা, দুর্নীতিবাজ নেই। সেখানে কোন ভিক্ষুক নেই। কোন বারবনিতাও নেই। ফুটপাতে কেউ সেখানে রাত কাটায় না। বিনা চিকিৎসায় কেউ সেখানে মারা যায় না। সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সে দেশে নেই। সেখানে সন্ত্রাস বা মাস্তানী নেই। বিশ্বে আজ একমাত্র দেশ কোরিয়া যা করমুক্ত। ১৯৭৪ সনের পর থেকে সে দেশের জনগণকে করের বোঝা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেয়া হয়েছে। আমাদের শাসনতন্ত্রের মতো কোরিয়ার শাসনতন্ত্র এতবড় নয়। কিন্তু তার ছোট্ট শাসনতন্ত্রে দেশের প্রতিটি নাগরিকের কর্মসংস্থান, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্র তার প্রতিটি নাগরিকের কর্মসংস্থান, গৃহসংস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে। যে রাষ্ট্র তার জনগণের এসব মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে পারে না বা দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে না তাকে সঠিক অর্থে একটি স্বাধীন ও জনকল্যাণমুখি রাষ্ট্র কোনভাবেই বলা যায় না। ঐ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা তার জনগণের নিকট অর্থহীন হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

(১) শাসনতন্ত্রে প্রতটি নাগরিকের অন্ন , বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার অধিকার চাই ১

(২) আমরা কি বাঁচতে পারি ৩

(ক) আমার রক্ত কথা কয় ৩

(খ) জনসংখ্যাই মূল সমস্যা নয় ৫

(গ) আমাদের সম্পদ— এত সম্পদ কয়জনের আছে। ৩০ কোটি লোক খাওয়ানোও কোন সমস্যা নয় ৬

(ঘ) একক সত্তার দিক দিয়ে আমরাই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতি ৯

(৩) কেউ কথা রাখেনি – কিন্তু কেন— তেঁতুল গাছে আম হয় না ১৩

(ক) কেন আমরা এত দুর্ভাগা– লাইন ছাড়া চলেনা রেলগাড়ী ১৪

(৪) এ রাষ্ট্রের মালিক কে ১৭

(ক) বিদেশী সাহায্য বিদেশীরাই খায়— এ এক সর্বনাশা নেশা ১৭

(খ) বহুজাতিকের খাঁচায় দেশীয় শিল্প বন্দী ২০

(গ) চোরাচালানী —এভাবে বন্ধ করলে অর্থনৈতিক জীবনে ধ্বস নেমে আসবে ২১

(ঘ) জাতীয় শিল্প বিকাশের সুযোগ কোথায় ২৩

(ঙ) দ্রব্যমূল্য ও অসহায় সরকার— অরণ্য রোদনে লাভ কি ২৫

(চ) আমাদের ধনীদের উত্থান বিকাশ ও চরিত্র ২৫

(৫) আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি— সন্ত্রাস দুর্নীতি এরা কেউই বন্ধ করতে পারবে না ২৮

(ক) আসল সন্ত্রাসী কারা ২৮

(খ) কেন মানুষ দুর্নীতি করে—তুমি কি প্রমোশন পেয়ে পেশকার হবে না–জজই থেকে যাবে চিরদিন ৩১

(গ) কোরিয়ায় কেন সন্ত্রাস দুর্নীতি নেই—সারা কোরিয়ায় ১২৮ জন উকিল ৩২

(ঘ) সৎ মানুষ না সৎ সমাজের কাঠামো ৩৪

(৬) অদ্ভুত আইন ও বিচার ব্যবস্থা —এ রাষ্ট্রের বিচার করার অধিকার নেই ৩৬

(ক) আইন ব্যবস্থা— আইনের শাসন চাই না ৩৭

(খ) বিচার ব্যবস্থা —এক ছেলে ভুলানো প্রতারণামূলক দাঁড়িপাল্লার নাটক ৩৮

(৭) শাসন বিভাগ—এ ধরনের সচিব, যুগ্মসচিব, ডিসি, এস পি, দারোগা দিয়ে জনকল্যাণমুখি রাষ্ট্র গড়া সম্ভব নয় ৪১

৪৪

www.pathagar.com

(৮) দয়িত্বহীন গণতন্ত্র ৪৪
(ক) জনগণকে রাজনীতির প্রভু হতে হবে ৪৫
(খ) নির্বাচন ব্যবস্থা—গরীব মানুষের শাসন মানে গণতন্ত্রের শাসন
(৯) অন্ন, বস্ত্র বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার দায়দায়িত্ব গ্রহণ করাই আমাদের মূল লক্ষ্য ৪৮
(ক) খাদ্য সমস্যা—কার খাবার কে খায় ৪৮
(খ) বস্ত্র সমস্যা—আমরাই একদিন ভারতবর্ষ ও ইউরোপের কাপড়ের চাহিদা মিটাতাম ৫২
(গ) বাসস্থান সমস্যা—যেমন আমার আয়ুব খান তেমন আমার মোনায়েম খান ৫৪
(ঘ) চিকিৎসা সমস্যা— অনেকে সারাজীবনে একটি প্যারাসিটামলের মুখ দেখেনি ৫৭
(ঙ) শিক্ষা ব্যবস্থা—লেখাপড়ার বিলাসিতা ওদের মানায় না ৫৮
(১০) পররাষ্ট্রনীতি ও দেশরক্ষা ব্যবস্থা— গরীবের বউ সবার ভাবী ৬০
(১১) নারী সমাজ— শত শত বৎসর মেয়েদেরকে আমরা জীবন্ত দাহ করেছি ৬২
(ক) পতিতা— কেউ না কে অবশ্যই আপনার আমার আত্মীয়া ৬৪
(খ) চাকরানী/গৃহভৃত্য—পাড়ার মেয়েদের চেয়েও ওদের অবস্থা খারাপ ৬৫
(১২) জাতীয় সত্তা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠা করা— আমরা সবাই রাজাকারের সহযোগী ৬৬
(১৩) আমরা নিজেরাই নিজেদের শৃঙ্খলে বন্দী—মানুষ নিজেই নিজের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় শত্রু ৭০
(ক) রাজনীতিবীদ হচ্ছে সমাজের ডাক্তার—হাতুড়েদের চিকিৎসায় জাতি শেষ অবস্থায় ৭১
(খ) আমরা এমনকি কোরিয়ান পন্থীও হতে পারি না ৭২
(১৪) পিপলস্ লীগ— একটি ব্যতিক্রম ধর্মী রাজনৈতিক দল গণশাসন— এক ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচী ৭৩
(ক) দুই বৎসরের মধ্যে দেশ গড়া—কল্পনা বিলাসী কোন চিন্তা নয় ৭৪
(১৫) নীতি ও আদর্শ প্রণয়নই শেষ কথা নয় ৭৫
(ক) প্রগতিশীল চিন্তার মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বের বিকল্প নেই এই মুহূর্তে ৭৫
(খ) গণআন্দোলন ছাড়া ক্ষমতা দখলের বিকল্প নেই ৭৬
(গ) গণআন্দোলন সংগঠিত করতে হলে কি করণীয়— গরীবও স্কুলে যাওয়ায় অক্ষমরাই দেশের জন্য বেশি জীবন দিয়েছে ৭৭
(ঘ) আত্মদানে প্রস্তুত ১০জন মানুষ চাই ৭৯

www.pathagar.com

(১) শাসনতন্ত্রে প্রতিটি নাগরিকের অন্ন বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা ও শিক্ষার অধিকার চাই

আমরা কি এমন একটি রাষ্ট্র গড়তে পারি যার শাসনতন্ত্র দেশের প্রতিটি নাগরিকের কর্মসংস্থান, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার নিশ্চয়তা দিবে। অর্থাৎ রাষ্ট্র প্রতিটি লোকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার দায়িত্ব নিবে। আমাদের শাসনতন্ত্রে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, সমাবেশ করার স্বাধীনতা, সংগঠন করার স্বাধীনতা, চলাচলের স্বাধীনতা ইত্যাদি অধিকার দেয়া আছে। বলা হয়েছে আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান, দেয়া হয়েছে আইনের আশ্রয় লাভে সমঅধিকার (যদিও এসব কাগজে কলমে)। শাসনতন্ত্রের ২৫ থেকে ৪৮ ধারায় এসব অধিকার প্রদান করা হয়েছে এবং এসব অধিকার খর্ব করা হলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাসনতন্ত্রের ১০২ ধারা বলে হাইকোর্টে রিট মোকদ্দমা করা যায়। কিন্তু অর্থনৈতিক জীবনের নিশ্চয়তা বিধান ছাড়া এসব স্বাধীনতা বা অধিকারের প্রকৃত মূল্য কোথায়? মানুষকে যেখানে অর্থের নিকট দাস ক'রে রাখা হয়েছে অর্থাৎ মানুষ যেখানে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পরাধীন বা অধিকারহারা সেখানে সত্যিকার অর্থে এসব মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেনা। বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা ইত্যাদির চেয়ে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদির অধিকার আরো মৌলিক। আর এসব অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রকৃত অর্থে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। আমাদের সমাজে একটি লোক না খেয়ে মারা গেলে, বিনা চিকিৎসায় মারা গেলে, নিদারুণ শীতে বিনা বস্ত্রে মারা গেলে রাষ্ট্র এতটুকু দায়-দায়িত্ব নেয় না। আমরা কি কল্পনা করতে পারি এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে তার একটি নাগরিক ক্ষুধায় কষ্ট পেলে বা মারা গেলে, বিনা চিকিৎসায় মারা গেলে বা শীতে মারা গেলে বা কর্মসংস্থান না থাকলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বর্তমানকার শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকার বলবৎ করার ন্যায় ব্যবস্থা নেয়া যাবে। অর্থাৎ কথা বলার স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা ইত্যাদি খর্বিত হলে যেমন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায় তেমনি জীবনের ৫টি মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হলেও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে। অন্য অর্থে মানুষের কর্ম-সংস্থান, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসার দায়-দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হবে। এখানে একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। গত বৎসর প্রচন্ড শীতের সময় যখন উত্তর বঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাসগৃহের অভাবে ও প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্রের অভাবে অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করছিলো, সে সময় কোরিয়া থেকে একটি ডেলিগেট এসেছিল। আমার চেম্বারে বসে আমাকে তারা প্রশ্ন করল, "এই যে শীতের কারণে তোমার দেশে এত লোক মারা যাচ্ছে এর দায়-দায়িত্ব কে নেয়"। প্রশ্নটি আমার জন্য বেশ বিব্রতকর

www.pathagar.com

ছিল। উপযুক্ত কোন উত্তর না থাকায় আমাদের দলের শ্রম সম্পাদক জনাব আব্দুর রব বিক্রমপুরী উত্তর দিলেন, "আল্লার মাল আল্লায় নিয়ে গিয়েছে, দায়-দায়িত্ব আবার কার কি"। আসলে কি তাই? আমরা যে শ্রেণী; রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছি তাদের কি এ ব্যাপারে কোন দায়-দায়িত্ব নেই অর্থাৎ আমরা কি এ ব্যাপারে দায়ী নই? আমি বলি অবশ্যই আমরা দায়ী। আমরা এমন একটি সমাজ কাঠামো তৈরি ক'রে রেখেছি যেখানে মানুষের এই করুণ পরিণতিই স্বাভাবিক। আমরা এমন একটি সমাজে বাস করি যেখানে একটি শ্রেণী নানাবিধ অবৈধ পন্থায় ব্যাপক জনগণকে শোষণ ক'রে চলেছে। দেশ-বিদেশে তাদের অর্থ-সম্পদ জমা হচ্ছে। কিছু সংখ্যক মানুষ সম্পদের পাহাড় গড়ে যাচ্ছে। আইন-কানুন, কোর্ট-কাছারী সবই তাদের সেবায় নিয়োজিত। অথচ আমাদের দেশের মানুষ না খেয়ে রাস্তা-ঘাটে মরছে। এ এমন একটি সমাজ যেখানে গুদাম ভর্তি চাল থাকলেও মানুষকে না খেয়ে মরতে হয়। ১৯৭৪ সনের দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের দেশে ৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য মজুত ছিল। অর্থাৎ তখনকার সময়ের সকল জনগণের ৩ থেকে ৪ মাসের খাবার ঘরে ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের কয়েক লক্ষ লোক না খেয়ে মারা গেল। ছিয়াত্তর-এর মন্বন্তর এবং ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের সময় অনেক খাদ্য অনেকের হাতে জমা থাকা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। আর এ ধরনের দুর্যোগের সময় এক ধরনের মানুষ জনগণকে এভাবে হত্যার মাধ্যমে সম্পদের পর সম্পদ গড়ে তোলে। এমনকি এখনও প্রতিদিন নীরব দুর্ভিক্ষে শত শত মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। অথচ আমরা এবার খাদ্যে প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়েছি। এ সমাজ ব্যবস্থা বহাল থাকলে খাদ্য উৎপাদন যতই বৃদ্ধি পাক না কেন অনাহারে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া কমবে না। এ এমন একটি সমাজ যেখানে ঔষধের স্তূপ থাকা সত্ত্বেও হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন বিনা চিকিৎসায় বিনা ঔষধে মৃত্যুবরণ করছে। এ এমন একটি সমাজ যেখানে শত শত বাড়ীতে "টু-লেট" ঝুলছে। অথচ প্রচন্ড শীতে হাজার হাজার মানুষ পথে-ঘাটে, ফুটপাতে, রেলষ্টেশনে, বাসষ্ট্যান্ডে, লঞ্চঘাটে এমনকি খোলা আকাশের নীচে একটি চটের বস্তা গায়ে দিয়ে রাত কাটায়। কাপড়ে বাজার ছয়লাব হয়ে গেলেও ওদের গায়ে এক টুকরা কাপড় উঠবে না। এ দেশের ৬ কোটি মানুষ সত্যি কথা বলতে কি এক বেলার বেশি খাবার পায় না। কর্মক্ষম লোকের ৩ ভাগের ১ ভাগই বেকার। বহুকাল ধরে আমাদের শিক্ষিতের হার ২০-২২ ভাগেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। ৭০ ভাগ লোক একরকম বিনা চিকিৎসাতেই মারা যাচ্ছে। এসবই হচ্ছে এ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ফল। আমরা এমন একটি দেশ চাই কোরিয়ার মত যে রাষ্ট্র তার জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার দায়িত্ব নিবে। দেশের শাসনতন্ত্রে প্রতিটি নাগরিকের জন্য এ সব অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া থাকবে। কেউ এসব অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে রাষ্ট্র তার জন্য দায়ী থাকবে। কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব?

www.pathagar.com

(২) আমরা কি বাঁচতে পারি

বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র রাষ্ট্র আমাদের এই বাংলাদেশ। সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ দুঃখ-কষ্ট বর্ণনাতীত। বারবার সরকার পরিবর্তন ক'রেও কেউ আশার আলো জ্বালাতে পারছে না। ক্ষুধা, রোগ-ব্যাধি, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, দারিদ্রতা ক্রমশঃ আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে গ্রাস করে চলছে। সমাজ জীবন ক্রমাগত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতা মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ ক'রে তুলেছে। স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি নেই। দেশ ও সমাজ সম্পর্কে যারা কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করেন তারা মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করে হতাশ। তারা বলে থাকেন এসব মানুষ দিয়ে কিচ্ছু হবে না। ফলে পুরো জাতি যেন নির্জীব হয়ে পড়েছে। মনে হয় এ জাতির কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই। তারপরও প্রশ্ন আসে, এতটুকু দেশ—বারো কোটি মানুষ। সম্পদ কোথায়, কি দিয়ে দেশ গড়ব? এত সামান্য সম্পদ দিয়ে একটি স্বাবলম্বী দেশ গড়ার চিন্তা বাতুলতা মাত্র। আর এই নিয়ে এত মানুষের ভরণ-পোষণ এক অসম্ভব ব্যাপার। মানুষ বেশির কারণে আমাদের অভাব-অভিযোগ দুঃখ-কষ্ট এক নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এরপর আছে নিজেদের মধ্যে অনৈক্য, বিভেদ ও হানাহানি। যদি জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি না থাকে তা'হলে কিভাবে একটি দেশ প্রগতির পথে এগুতে পারে। বিষয়গুলি এভাবে দেখলে হতাশ না হয়ে উপায় নেই। তবে আমরা মনে করি, এভাবে হতাশ না হয়ে এ বিষয়গুলির গভীরে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়োজন আছে। তাই আমাদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিচার করতে হবে।

(ক) আমরা কি একটি নির্জীব জাতি, একটা সুন্দর দেশ গড়ার সংগ্রাম করার মত শক্তি ও ক্ষমতা আমাদের আছে কি, আমাদের রক্ত কি সে ঐতিহ্য বহন করে?

(খ) জনসংখ্যাই কি আমাদের প্রধান সমস্যা, জনসংখ্যা কমলেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?

(গ) আমাদের যে সম্পদ আছে তা দিয়ে কি দেশ গড়া ও সবার বাঁচা সম্ভব?

(ঘ) আমাদের জনগণ কি দেশ গড়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মত কোন একক সত্তা আমাদের আছে কি?

(ক) আমার রক্ত কথা কয়

আমাদের দেশের মানুষ তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করার জন্য যুগে-যুগে সংগ্রাম করেছে। তারা একদিকে বিদেশী আগ্রাসন, শাসন শোষণ ও নিপীড়ণের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। অন্যদিকে জাতীয় শোষণ, বঞ্চনা ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধেও তারা সংগ্রাম করেছে। সংগ্রামের এক ঐতিহ্যমন্ডিত জাতি আমরা। এ জাতির সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল তাদের সম্পদ। যার ফলে বারবার বিদেশী দস্যুরা আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। আর্য, শক, হুন, পাঠান, মুঘল, মারাঠা, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ এরা বারবার নানাভাবে আগ্রাসন চালিয়েছে আমাদের উপর, আমাদের কোটি কোটি টাকার সম্পদ এরা লুঠ করেছে। কিন্তু আমাদের জনগণ বলিষ্ঠতা ও সাহসের সাথে এদের বিরুদ্ধে যুগে যুগে সংগ্রাম করেছে। মুঘল শাসনকে কোনদিনই তারা মেনে নেয়নি। অসংখ্য বিদ্রোহ এবং আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের ইতিহাস হচ্ছে মুঘল যুগ। আর ইংরেজদের মেনে নেওয়ার প্রশ্নই ছিল না। বারবার তারা স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ইংরেজ এবং তার দেশীয় সহযোগী দেওয়ান, জমিদার ও জোতদারদের শাসন শোষণ লুন্ঠন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং আত্মবলিদান তারা করেছে। আর আমাদের ধমনীতে এসব বিভিন্ন সংগ্রামের রক্ত বইছে। যেমনঃ ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ত্রিপুরা বিদ্রোহ, সন্দ্বীপের বিদ্রোহ, মস্‌লিন তন্তুরায়দের সংগ্রাম, নীল চাষীদের সংগ্রাম, রংপুর বিদ্রোহ, চোয়াড় বিদ্রোহ, ওয়াহাবী বিদ্রোহ, ফরায়েজী বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, সিরাজগঞ্জের বিদ্রোহ, শালাঙ্গা বিদ্রোহ, অসহযোগ আন্দোলন, বৃটিশ খেদাও আন্দোলন, লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলন ও তেভাগা আন্দোলন সহ অসংখ্য আন্দোলন সংগ্রাম। এরপর পাকিস্তানী শাসন শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে তারা করেছে ভাষা আন্দোলন, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, ৬৯-এর গণআন্দোলন, সর্বোপরি একাত্তরের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও যুদ্ধ। আর পূর্বকালে রয়েছে, আর্য, শক, হুন, মুঘল, পাঠানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। মুঘল আমলের বারো ভূঁইয়ার সংগ্রামের কথা আজও লোকমুখে ফিরে। এর আগে আরও রয়েছে কৈবর্ত বিদ্রোহ সহ অনেক বিদ্রোহ ও সংগ্রাম। আমাদের রক্তে এসব আন্দোলন সংগ্রাম কথা কয়।

আমরা হচ্ছি সেইসব বীরপুরুষদের উত্তরাধিকার—যাদের স্বাধীনতার আকাঙ্খা, জাতি হিসাবে আমাদেরকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা, আত্মদান ও সংগ্রাম আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে। এরা হচ্ছেন শ্রী-গুপ্ত, শশাঙ্ক, গোপাল, ধর্মপাল, আলী মর্দান, ইখতিয়ার উদ্দিন উযবক, মুঘিস উদ্দিন তুঘরল, গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহ্, ফকরউদ্দিন মুবারক শাহ্, সুলতান ইলিয়াস শাহ্, গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ্, আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্, দাউদ খান কররানী, ঈসা খাঁ, মুসা খাঁ, প্রতাপআদিত্য, বিক্রমআদিত্য, ওসমান খাঁ, কেদার রায়, সিরাজদ্দৌলা, মীর কাসিম, সমশের গাজী, মজনু শাহ্, নূরুল উদ্দীন, তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ্, দুদুমিঞা, সুভাস বোস, সূর্যসেন, প্রীতিলতা, ইলামিত্র, ক্ষুধিরাম, শেরেবাংলা ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী, মনিসিং, হাজী দানেশ এবং শেখ মুজিবসহ আরো বহু জাতীয় বীর। এদের স্মরণ ক'রে আমরা গর্বিত

www.pathagar.com

ও অনুপ্রাণিত। এদের দিকে তাকিয়ে আমরা আমাদের আত্মপরিচয়, পূর্বপুরুষের পরিচয়, সংগ্রামের ঐতিহ্য খুঁজে পাই। আমাদের রক্তে ওদের সুর বাজে।

কাজেই একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, এ জাতি সংগ্রাম করতে জানে। সংগ্রাম করার শক্তি ও সামর্থ্য এদের রয়েছে। এটা কোন অসার বা ঘুমন্ত জাতি নয়। এ জাতির রক্তে রয়েছে বহু সংগ্রামের ঐতিহ্য। এত সংগ্রাম ঐতিহ্যের অধিকারী জাতি দুনিয়ায় বিরল। আর যারা সংগ্রাম করতে জানে তারা নিজের ভাগ্যও গড়তে জানে।

বিঃ দ্রঃ আমাদের সকল সংগ্রাম ও বিপ্লবের ইতিহাস এবং আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের বর্ণনা ও আমাদের জাতি সত্তার উৎপত্তি ও বিকাশ এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে "রক্ত কথা কয়" নামে আমার পরবর্তী বই প্রকাশিত হওয়ার পথে।

(খ) জনসংখ্যাই মূল সমস্যা নয়

অনেকেই বলে থাকেন আমাদের যে বিরাট জনসংখ্যা তার ভরণ-পোষণ আমাদের এই সীমিত সম্পদ দিয়ে সম্ভব নয়। ৫৫ হাজার বর্গমাইলের এই ছোট্ট দেশে ১২ কোটি লোকের অন্নসংস্থান এক অসম্ভব ব্যাপার। অর্থাৎ জনসংখ্যাই আমাদের মূল সমস্যা। জনসংখ্যা বেশির কারণে আমাদের মানুষ খেতে পারে না, পরতে পারে না, চিকিৎসা পায় না, মাথা গোঁজার ঠাঁই পায় না। তাদের কথায় মনে হয় যেন জনসংখ্যা কমে গেলেই আমাদের সকল সমস্যা দূর হয়ে যাবে। আসলে কি জনসংখ্যাই আমাদের মূল সমস্যা? অতীতের দিকে যদি তাকাই তা'হলে দেখতে পাই, যখন আমাদের জনসংখ্যা অনেক কম ছিল তখনো মানুষ না খেয়ে মরেছে। ছিয়াত্তরের (১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে) মন্বন্তরের কথা আমরা জানি। যখন পশ্চিম বাংলাসহ সারা বাংলায় দুই কোটি লোকও ছিল না। তখনও ঐ দুর্ভিক্ষে বাংলার এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুবরণ করে। সে সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন " চাষীরা ক্ষুধার জ্বালায় তাহাদের সন্তান বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু তাহাদের কে কিনিবে, কে খাওয়াইবে? বহু অঞ্চলে জীবিত মানুষ মৃতের মাংস খাইয়া প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং নদীতীর মৃতদেহ ও মুমূর্ষুদেহে ছাইয়া গিয়াছিল। মরিবার পূর্বেই মুমূর্ষুদের দেহের মাংস শেয়াল-কুকুরে খাইয়া ফেলিত।" সেদিনকার সে লোমহর্ষক চিত্র বর্ণনার কোন ভাষাই নেই।

তিতাল্লিশের (১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ)দুর্ভিক্ষের কথা অনেকেরই স্মরণ থাকতে পারে। তখন সারা বাংলায় সাত কোটির বেশি লোক ছিল না। অথচ সে দুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে। ভাতের মাড়টুকুর জন্য মানুষের যে কি আকুতি তার অনেক কথাই আমরা শুনেছি। মানুষ সেদিন মানুষ ছিল না। মানুষ সেদিন শিয়াল-কুকুরেরও অধমে পরিণত হয়েছিল। এইতো সেদিন ৭৪ সনের দুর্ভিক্ষে আমাদের কয়েক লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে। এই ঢাকা শহরেও সেদিন

www.pathagar.com

অনেককে দেখেছি ঘাস-মাটি খেয়ে বাঁচতে চেষ্টা করার। নোঙ্গরখানার একটি রুটি বা একমুঠ খিচুরী পাওয়ার জন্য মানুষ পাগলের মত ছুটেছে। অথচ সেদিন আমাদের লোকসংখ্যা এখনকার থেকে কমপক্ষে প্রায় ৪ কোটি কম ছিল।

এরও আগে মুঘল আমলেও দেখতে পাই দুর্ভিক্ষে বহুলোক মৃত্যুবরণ করেছে। মীরজুমলার আসাম অভিযান কালে বাংলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ দুর্ভিক্ষ প্রায় দু'বছর স্থায়ী হয়। হাজার হাজার মানুষ এ দুর্ভিক্ষে মারা যায়। জিনিসপত্রের দাম খুব বৃদ্ধি পায়। জনগণের দুঃখ-কষ্ট এত তীব্র আকার ধারণ করে যে, মীরজুমলার সহকর্মী ঐতিহাসিক শিহাবুদ্দিন তালিশের কথায় ''রুটি হতে জীবন সস্তা মনে হত এবং রুটি পাওয়া যেত না"। সেদিন সারা বাংলায় লোকসংখ্যা ১/১$\frac{১}{২}$ কোটির বেশি ছিল না। আবার খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ক ম থাকলেই যে মানুষ সুখে থাকবে তাও ঠিক নয়। শায়েস্তা খাঁর আমলে যখন টাকায় আটমণ চাল পাওয়া যেত তখনও মানুষ না খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। এসব কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, লোকসংখ্যাই আমাদের মূল সমস্যা নয়, লোকসংখ্যা কমে গেলে সব সমস্যার সমাধান যে হবে না তা দেখানো। লোকসংখ্যা মূল সমস্যা হলে গত পঞ্চাশ বছরে যেভাবে মানুষ বেড়েছে তাতে আজকে আমরা কেউই বেঁচে থাকতে পারতাম না। মূল সমস্যা অন্যত্র— যা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। এসব জাতীয় কথা বলে আমি অবশ্য আরো মানুষ বৃদ্ধি করার কথা বা পরিবার পরিকল্পনার বিরোধিতা করছি তা নয়। অবস্থা ভাল হলেই যে ঘরভর্তি ছেলেমেয়ে কিলবিল করবে তা ঠিক নয়। লোকসংখ্যা বেশি বলেই মানুষের অভাব অভিযোগ কষ্ট বেশি, এই বলে বড়লোকেরা যে বুঝ দেয় তা যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাদের শোষণকে বহাল রাখার জন্য ক'রে থাকে তা বুঝানোর জন্যই এসব কথা বললাম।

(গ) আমাদের সম্পদ—এত সম্পদ কয়জনের আছে

৩০ কোটি লোক খাওয়ানোও সমস্যা নয়

আমাদের যে সম্পদ আছে অনেকেই বলে থাকেন তা দিয়ে কোনভাবেই আমাদের বার কোটি লোকের ভরণ-পোষণ সম্ভব নয়। আসলে কি তাই? আমরা মনে করি, আমাদের যে সম্পদ আছে তার সুষ্ঠ ও জনকল্যাণমুখি ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে ১২ কোটি কেন ৩০ কোটি লোককেও খাওয়ানো-পরানো কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখতে পারি। তবে তার আগে একটি বিষয় বলে নেই। যদি প্রশ্ন করা হয় সৌদি আরব, কাতার বা কুয়েত ধনী না বাংলাদেশ ধনী; যদি বলা হয় আমরা ওদের থেকে ধনী তা'হলে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করবেন। ওদের এতো পেট্রোডলার, সবসময় ওদের কাছে আমাদের হাত পাততে হয়—আর আমরা ওদের থেকে ধনী এ আবার কেমন কথা। বিষয়টি যদি এভাবে বলা যায় তাহলে কি দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

ওদের দেশ যত বড়ই হোক, যত অর্থই ওদের থাক আমাদের ১২ কোটি লোক ওখানে পাঠিয়ে দিলে কয়দিন পর ওরা চা-বিস্কুটও খাওয়াতে পারবে না। আর আমাদের স্থলে এখানে সৌদি আরবের ৬০ লক্ষ বা কুয়েতের ৯ লক্ষ লোক বসিয়ে দিলে ওদেরকে সোনার পালঙ্কে রেখে খাওয়াতে পারব। এমনকি ওদের দেশের সমস্ত মানুষকে এখানে এনে আমাদের সঙ্গে এখন রাখলেও খুব বেশি অসুবিধা হবে না। তাহলে আসল ধনী কে? যাহোক দেখা যাক আমাদের সম্পদের হিসাব।

বিশ্বের সবচেয়ে উর্বরতম ভূমি হচ্ছে আমাদের এই অঞ্চল। অথচ আমাদের উৎপাদন হার সবচেয়ে কম। একর প্রতি গড়ে খাদ্যশস্য উৎপাদন ১৮ মণ। অথচ আমাদের চেয়ে অনেক অনুর্বর ভূমি নিয়ে উন্নত দেশগুলিতে উৎপাদন হয় ৮০ থেকে ১০০ মণ। আমরা বৎসরে গড়ে ১$\frac{১}{২}$টির বেশি ফসল ফলাতে পারি না। অর্থাৎ কিছু জমিতে ১টি, কিছু জমিতে ২টি ফসল ফলাই। অন্যদিকে সেসব দেশে ৩/৪ টি ফসল ফলে। সামান্য একটু চাষ দিয়ে বীজ ছড়ালে এখানে ফসল ফলে। কোরিয়া ও চীনে দেখেছি কতো কঠিন অবস্থার মধ্যে তারা চাষাবাদ করে। পাহাড় কেটে সমান ক'রে আলগা মাটি ফেলে সেখানে ফসল জন্মাতে হয়। পুরো শীতে এই দেশগুলিতে প্লাষ্টিকের ঘর তৈরি ক'রে তার ভেতর গ্যাস জ্বালিয়ে তাপ ঠিক রেখে অনেক ফসল ফলান হয়। সেদিক দিয়ে আমরা কত ভাল অবস্থানে রয়েছি। আমাদের উৎপাদনের দিকে যদি লক্ষ্য করি তা'হলে দেখতে পাই এ বৎসর আমরা প্রায় ২ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করেছি এবং খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। ১৯৪৮ সনে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪৮$\frac{১}{২}$ লক্ষ টন। ৬৭-৬৮ সনে ছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ টন। এখন সেখানে ২ কোটি টন। আমি এর মধ্যে কয়েকটি জেলা ঘুরে দেখলাম। এই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান উৎস হচ্ছে কিছু কিছু জমিতে সার, কীটনাশক প্রয়োগ এবং পানি সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে এর আওতায় জমির পরিমাণ মোট জমির $\frac{১}{৪}$ ভাগের বেশি নয়। সত্যি কথা বলতে গেলে যদি আমাদের সকল জমি উন্নত চাষাবাদের আওতায় আনতে পারি তা'হলে এর ৩/৪ গুণ অর্থাৎ ৬ থেকে ৮ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারি। যার মানে বর্তমান লোক সংখ্যার ৩/৪ গুণ লোকের ভরণ-পোষণ আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। একটি বিদেশী বিশেষজ্ঞ দল বলেছে বাংলাদেশ বিশ্বের একটি খাদ্যের গোডাউন হতে পারে। কৃষি উৎপাদন সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়। পরবর্তীতে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

আরও দু'একটি সম্পদের কথা বলা যাক। আমাদের মাছ চাষের উপযোগী প্রায় ২০ লক্ষ হাজামজা পুকুর রয়েছে। বলা হয়ে থাকে এক একর ধানের জমিতে যে প্রোটিন উৎপন্ন হয় এক একর মাছের জমি হতে তার দ্বিগুণেরও বেশি প্রোটিন পাওয়া যায়। আমরা ৮ লক্ষ টনের মতো মাছ উৎপাদন ক'রে

www.pathagar.com

থাকি। কিন্তু চাহিদা ১২ লক্ষ টন। আমরা যদি এই পুকুরগুলি ঠিক মতো মাছ চাষের আওতায় আনতে পারতাম তা'হলে নিজস্ব প্রোটিনের চাহিদা মিটিয়েও শত শত কোটি টাকার মাছ রপ্তানি করতে পারতাম। মাছ চাষ ছাড়াও পুকুর ও তার পাড়ে আরও অনেক কিছু করা সম্ভব। যেমন হাঁস পালন, মুক্তা চাষ করা, গাছ লাগান, মুরগী পালন, গরু ছাগল পালন ইত্যাদি। ৫ জন করে লোকও যদি ১টি পুকুরে কাজ করে তা'হলে ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব। তবে প্রচলিত ব্যবস্থাধীনে এসব হাজামজা পুকুরের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এর রাস্তা ভিন্ন। নিবিড় চাষের আওতায় চিংড়ি মাছ চাষ করলে শুধু এখাত থেকেই বৎসরে ২৪ হাজার কোটি টাকা আয় হতে পারে। আমাদের সমুদ্রে ৪৮ হাজার বর্গনটিক্যাল মাইলের উর্ধ্বে মাছ চাষ উপযোগী জলাশয়ে যে মাছ সম্পদ রয়েছে তাকে রীতিমতো সোনার খনি বলা যায়। আমাদের আছে ২০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস। শুধু এই গ্যাসের সুষ্ঠ ও পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে একটি সম্ভাবনাময়ী দেশ হিসাবে আমরা দাঁড়াতে পারি। সার তৈরি সহ গ্যাস ভিত্তিক বহু শিল্প গড়ে উঠতে পারে। আমাদের আছে ১৫০ বৎসরের বেশি নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর মত তেল সম্পদ। আরো আছে ২০০ কোটি টন কয়লা। আমাদের বৎসরে প্রয়োজন মাত্র ২০ লক্ষ টন, অর্থাৎ ১০০০ বৎসরের প্রয়োজন মেটানোর মতো কয়লা আমাদের রয়েছে। আমাদের সমুদ্র উপকূল এবং এর নিকটস্থ দ্বীপগুলিতে প্রায় ৫০ লক্ষ টন মহামূল্যবান খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। যেমনঃ জিরকন, ইলমেনাইট, রুটাইল, গার্নেট, ম্যাগনেটাইট, কায়ানাইট, মোনাজাইট, টাইটেনিয়াম ইত্যাদি। এর মূল্য কত তা একজনের পক্ষে ধারণা করাও সম্ভব নয়। ব্যবসায়িক দিক দিয়ে এই সম্পদ স্বর্ণের খনি অপেক্ষা লাভজনক। এর একটি পদার্থরই বিশুদ্ধ অবস্থায় মূল্য ৫ লক্ষ কোটি টাকা। এছাড়াও আমাদের আছে চুনাপাথর, কঠিন শিলা, নুড়ি পাথর, চীনা মাটি, সিলিকা বালি, কোয়ার্টজ ইত্যাদি খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ। চামড়ার সুষ্ঠ ব্যবহার হলে এখাত থেকে আমরা কয়েক•হাজার কোটি টাকা আয় করতে পারি। ব্যাপক কুটির শিল্পের বিকাশ এবং হাঁসমুরগী ও গবাদী পশুপালন আমাদেরকে বেকারত্ব হ্রাস ও স্বনির্ভর করতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। আমরা একদিন নিজস্ব তুলা দিয়ে সারা ভারতবর্ষ সহ ইউরোপের কাপড়ের চাহিদা মিটিয়েছি। একটু উদ্যোগী হলেই ব্যাপক তুলা উৎপাদন করা সম্ভব। একই সঙ্গে রবার উৎপাদনের ব্যাপক প্রকল্প গ্রহণ করতে পারি। ব্যাপকহারে মুক্তা চাষ সম্ভব। গার্মেন্টস্ ও ইলেকট্রনিক্স শিল্পের ব্যাপক বিকাশের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া আমাদের রয়েছে আরো প্রাকৃতিক ও অর্থকরী সম্পদ— যেমন পাট, চা, তামাক, রেশম, আলু, ইক্ষু, বনসম্পদ, গো-সম্পদ ইত্যাদি যার সুষ্ঠ ও পরিকল্পিত উৎপাদন ও ব্যবহার আমাদের জন্য সৃষ্টি করতে পারে নিশ্চিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। সর্বোপরি আমাদের রয়েছে বিরাট এক কর্মক্ষম জনসম্পদ। জনসম্পদ যে কত বড় শক্তি

www.pathagar.com

তা চীন দেশে গিয়ে বুঝলাম। শত শত মাইল রাস্তা তৈরি, নদী খনন বা পাহাড় কাটতে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিয়োজিত হয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ছাড়াই হাতুড়ী বাটাল দুরমুজ নিয়ে শ্রমের বিনিময়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে তা সমাধা করেছে। কোরিয়ায়ও এ ধরনের জনশক্তি ব্যবহার প্রচুর দেখা যায়। বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি ক'রেও প্রচুর আয় বাড়ানো যেতে পারে। এসব ছাড়াও আমাদের আরও অনেক সম্পদ রয়েছে যার বিস্তারিত বিবরণ এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয়। অনেক সম্ভাবনা খুঁজে বের করারও আছে।

এতসব সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমাদের এত দরিদ্র থাকার কথা নিশ্চয়ই নয়। তা'হলে কেন আমাদের এই দারিদ্রতা, কেন এই বঞ্চনা, কেন এই হতাশা, কেন এই অভিশপ্ত জীবন। কেন আমাদের দু'মুঠো খাবারের জন্য প্রতি বছর ভিক্ষার থলি হাতে বিভিন্ন দেশে ধর্ণা দিতে হয়। কেন আমাদের ৬ কোটি মানুষ এক বেলার বেশি খাবার পায় না। কেন আমাদের অধিকাংশ লোক দারিদ্র-সীমার নীচে বাস করে। কেন আমাদের ৬০ ভাগ লোক অপুষ্টিতে ভোগে। কেন আমাদের তিন ভাগের এক ভাগ লোক অসহনীয় বেকারত্বে জীবন যাপন করে। কেন আমাদের ৭৮ ভাগ মানুষ অশিক্ষিত। কেন আমাদের অধিকাংশ মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। কেন আমাদের মা-বোনেরা ইজ্জত বাঁচাতে অন্তত দু'খানা কাপড় পায় না, আর কেনইবা লক্ষ লক্ষ মানুষের মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু নেই। এর কারণ কি? তা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

(ঘ) একক সত্তার দিক দিয়ে আমরাই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতি

একটি জাতির উন্নতির সবচেয়ে বড় শর্ত হচ্ছে তার জনগণের ঐক্য। পুঁজিবাদী সমাজে যেখানে মানুষে মানুষে স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকে, আকাশ পাতাল ব্যবধান থাকে, সেখানে জনগণের ঐক্য প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার যে সুযোগ রয়েছে তা দুনিয়ায় আর কারো নেই। আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে বিশ্বে আমাদের মতো এত বড় জাতি আর নেই। আমাদের মধ্যে জাতিগত, ধর্মগত, ভাষাগত, কৃষ্টিগত, ভৌগলিক অবস্থানগত বিভেদ একরকম নেই। বারো কোটি মানুষের দেশ যেখানে ধর্মের কোন বিভেদ নেই বল্লেই চলে। অনেক দেশেই ধর্ম নিয়ে মানুষে মানুষে হানাহানি চলে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা সে অবস্থা একরকম উৎরে এসেছি। সামান্য ইচ্ছাতেই আমরা ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা ক'রে চলতে পারি। অনেক দেশ আছে যেখানে একই ধর্মের লোকের মধ্যেও বিভাজনের কারণে হানাহানি ঘটে থাকে। যেমন শিয়া-সুন্নী, ব্রাহ্মণ-হরিজন, ক্যাথলিক-প্রটেষ্টান্ট। সেরকম অবস্থাও আমাদের নেই। বারো কোটি লোকের মূলত একটি ভাষা। এক ভাষার ঐতিহাসিক ধারক-বাহক আমরা। ভাষা নিয়েও কোন বিভেদ বা হানাহানীর সুযোগ নেই। আমরা সবাই একই সংস্কৃতির ধারক-বাহক। সবার খাবার-দাবার, পোষাক-পরিচ্ছদ,

www.pathagar.com

আচার-আচরণ, রুচি-অভ্যাস একই রকম বলা চলে। প্রায় সবার সঙ্গেই সবার আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়। সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীগত পার্থক্য নেই আমাদের মধ্যে। একই ভূমিতে আমরা সবাই বাস করি। ভৌগলিক অবস্থানের দিক দিয়েও কোন কিছু আমাদেরকে পৃথক ক'রে রাখেনি। অঞ্চলগত কোন পার্থক্যও নেই। একই আবহাওয়া, একই জলবায়ুতে আমরা সবাই মানুষ। বারো কোটি মানুষের এমন একটি সুষম জাতি সারাবিশ্বে আর একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন একটি অনন্য জাতি আর কোথাও নেই। পাকিস্তান বা ভারতের মত কৃত্রিমভাবে এ জাতি কেউ গড়ে তোলেনি। দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্তনে আমাদের এ জাতির উদ্ভব। ঐতিহাসিক বিবর্তনে গঠিত জাতি, আর সে জাতি নিয়ে দেশ, তা সত্যিই বিশ্বে বিরল। তারপর এতবড় জাতি। এতটুকু শ্রীলংকা যেখানে ভিন্ন জাতি সত্তার কারণে তামিল ও সিংহলীদের মধ্যে যুদ্ধ ও রক্তক্ষয় লেগেই আছে। ভারতের কথা এ প্রসঙ্গে বলা নিষ্প্রোয়োজন। বিভিন্ন জাতি সত্তার কারণে ও বিরোধে ভারতের ত্রাহী ত্রাহী অবস্থা। ভিন্ন জাতি সত্তার কারণে সোভিয়েট রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে। সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বে অনেক দেশই দুর্যোগে নিমজ্জিত। সব মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের মানুষ ভাষা ও জাতিগতভাবে কমপক্ষে চার ভাগে বিভক্ত—যাদের মধ্যে বিরোধ ও হানাহানি ক্রমশই বেড়ে চলেছে। এরপর মহাজেররা সেখানে আর এক সমস্যা। এ প্রসঙ্গে আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। আপনারা জানেন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে কোরিয়া আজ দ্বিধাবিভক্ত। যদিও তারা ঐতিহাসিকভাবে এক জাতি। কোরিয়ার জনগণের একান্ত আকুতি যে দেশের পুনঃএকত্রিকরণ। প্রেসিডেন্ট কিম ইল্ সুং অনবরত এ ব্যাপারে দাবী ক'রে আসছেন। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দক্ষিণ কোরিয়ার তাবেদার সরকার এতে কর্ণপাত করছে না। বিশ্ব বিবেকও পুনঃএকত্রিকরণের পক্ষে। গত বছর (১৯৯২) কোরিয়ার পুনঃএকত্রিকরণের দাবীতে করাচীতে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে বেশ কিছু প্রতিনিধি সে সম্মেলনে উপস্থিত হন। বাংলাদেশ থেকে আমার সে সম্মেলনে যোগ দেয়ার সুযোগ হয়েছিল। আমরা বিদেশী প্রতিনিধিরা যে হোটেলে ছিলাম তারই নীচতলায় সম্মেলন কক্ষে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের প্রধান অতিথি ছিলেন সিন্ধুর তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের স্পীকার মিঃ রাজীক খান। বিকেলে সম্মেলন শুরু হয়। আমি ছিলাম লীড স্পীকার। ফলে আমাকে প্রথম বক্তব্য উদ্বোধন করতে হয়। রাজীক খানের সঙ্গে এর পূর্বে ঐদিনই দুপুরে আমার পরিচয় হয় কিম জং ইল এর ৫০ তম জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে 'আলি আলি স্কুল' এর এক অনুষ্ঠানে। আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর তিনি বাংলায় আমার সঙ্গে কথা বলা শুরু করলেন। জানলাম তিনি বিহার থেকে আগত মহাজের। ৭১ সন পর্যন্ত ঢাকার মহম্মদপুরে থাকতেন। এরপর তিনি পাকিস্তানে গিয়ে ওখানকার রাজনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন। মহাজেরদের

www.pathagar.com

পাকিস্তানের রাজনীতিতে বিরাট প্রভাব। যাহোক সম্মেলনের কথা বলছিলাম। আমরা বিদেশীরা সবাই ইংরেজীতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেছিলাম। সবার শেষে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রাঞ্জল উর্দ্দু ভাষায় রাজীক খান কোরিয়ার পুনঃএকত্রিকরণের দাবী অত্যন্ত দৃঢ় ও জোড়ালোভাবে সমর্থন ক'রে তার অলিখিত বক্তব্য দিতে থাকলেন। তার ভাষণের শেষ পর্যায়ে বলে বসলেন, ''শুধু কোরিয়ার পুনঃএকত্রিকরণের দাবী সর্মথন করলেই চলবে না। সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে কোরিয়া আজ যেমন বিভক্ত পাকিস্তানও তেমনি বিভক্ত রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে রয়েছে। আমরা পাকিস্তানের পুনঃএকত্রিকরণ চাই।" হল ভর্তি প্রায় ৫০০ শত মানুষ মুহুর্মুহু হাততালি দিচ্ছিল। আমার চোখমুখ লাল হয়ে উঠে। আমার পাশে বসা শ্রীলংকার একজন এম, পি, মিঃ রানাতুঙ্গে (প্রখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় রানাতুঙ্গের বাবা) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন পাকিস্তানের পুনঃএকত্রিকরণ কি সম্ভব? আমি বল্লাম ''এরা চিরকালই আহম্মক এবং আহম্মকের স্বর্গে এরা বাস করে।" সবার জন্য ডিনারের ব্যবস্থা ছিল। আমি প্রতিবাদ জানিয়ে ডিনার না খেয়েই রুমে চলে এলাম। কিছুক্ষণ পরেই আমার রুমে ৮/১০ জন লোক আসল। তারা অতি বিনীতভাবে প্রশ্ন করল, স্পীকার রাজীক খানের ঐ বক্তব্যের সময় আমার মুখচোখের ভাব অন্যরকম দেখাচ্ছিল কেন এবং আমি মাথা নাড়ালাম কেন? রানাতুঙ্গকে আমি কি বল্লাম? এভাবে চলে এলাম কেন? পাকিস্তানের মাটিতে এ বিষয় নিয়ে ওদের সঙ্গে আলোচনা বা বিতর্ক করার ইচ্ছে ছিল না। আমি বিষয়টি পাশ কাটাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওরা নাছোরবান্দা। স্পীকারের ঐ বক্তব্য সম্পর্কে আমার মতামত কি জানার জন্য খুবই পীড়াপীড়ি করতে লাগল। শেষে মুখ খুলতে বাধ্য হলাম। আমি বল্লাম, "আমি বুঝতে পেরেছি আপনাদের মনের আগ্রহ। দেখুন পাকিস্তান সৃষ্টির ব্যাপারে আপনাদের চেয়ে আমাদের অবদান অনেক বেশি ছিল এবং আমরা ইংরেজদের দ্বারা অনেক বেশি নিগৃহীত হয়েছি। কিন্তু ২৪ বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য বড়ই তিক্ত। শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে যখন বাঙ্গালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তখন ক্ষমতা দেয়াতো হলোই না বরং আমাদের ৩০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হলো, ২ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত হানী করা হল।" একজন বলল্ এত হবে না। আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, কত হবে বলুন? সে চুপ করে গেল, এ নিয়ে আর বিতর্ক করলো না। আমি বললাম, "এত কিছুর পরও আঞ্চলিক রাজনীতির স্বার্থে স্বাধীন দেশ হিসাবে আপনাদের সঙ্গে একটি ভাল সম্পর্ক আমরা চাই। আমরা সবাই সার্কভূক্ত দেশ। কিন্তু তার জন্য উদ্যোগ আপনাদেরকেই নিতে হবে। আজ পর্যন্ত কি পাকিস্তানের কোন নেতা আমাদের দেশের এই গণহত্যার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে বা ক্ষমা চেয়েছে? আমাদের মনের দাগ অনেক বড়। আজও করাচীর রাস্তায় হাটলে এ সমস্ত দালান-কোঠা থেকে আমি আমার পাটের গন্ধ পাই। অথচ আমাদের সঙ্গে হিসাবের দেনা-পাওনাও মিটালেন না।'' তখন তারা স্বীকার করলো যে তাদের নেতারাই মূলত

www.pathagar.com

পাকিস্তান ভাঙ্গা এবং গণহত্যার জন্য দায়ী। আমি বল্লাম, ''আমরা ১২ কোটি মানুষ ভাষা, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ইত্যাদির দিক দিয়ে এক অনন্য জাতি। এত বড় জাতি বিশ্বে আর নেই। এক ঐতিহাসিক বিবর্তনে আমাদের এ জাতির উদ্ভব। আমাদের কথা চিন্তা না ক'রে যা আছে তাই নিয়ে আপনারা এক থাকতে পারেন কিনা তাই দেখুন। আপনারা এক থাকলেই আমরা খুশী"। তখন তারা বল্‌ল, "তা বোধ হয় সম্ভব হবে না। পাঞ্জাবীরা খুব জ্বালায়। ওদের সঙ্গে আর বেশি দিন চলা সম্ভব নয়"। আমি বল্লাম, ''তাহলে আর এই উদ্ভট চিন্তা কেন?" যা হোক এর পরের দিন ভারতের প্রতিনিধি মিঃ ওম প্রকাশ মন্ত্রী বেশ সুযোগ নিলেন। তিনি বলে বেড়াতে লাগলেন, ''শুধু পাকিস্তানের পুনঃএকত্রিকরণ কেন? ইন্ডিয়ার পুনঃএকত্রিকরণ নয় কেন? সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে ইন্ডিয়া ভেঙ্গে পাকিস্তান হয়েছে। পরে বাংলাদেশ হয়েছে। কাজেই আমরা ভারতের পুনঃএকত্রিকরণ চাই"। তিনি অবশ্য হাস্যকৌতুক করেই কথাগুলো বলেছিলেন। এই হাস্যকৌতুকে কয়েকজন পাকিস্তানীও যোগ দেয় তার পক্ষে। আমি বল্লাম, "বাংলাদেশ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ফসল নয়। এটা আমাদের শত শত বৎসরের সংগ্রামের ফসল। এটা আমাদের সত্তার তন্ত্রীর সুর। তবে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত অবশ্যই ছিল। তা হচ্ছে আমাদেরকে বিভক্ত ক'রে একটি কৃত্রিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, আর আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যাও ছিল আর একটি চক্রান্ত"।

যা হোক যে কথা বলছিলাম। বিশ্বে সব দেশেই এ ধরনের ধর্মগত, ভাষাগত, জাতিগত, সম্প্রদায়গত, গোষ্ঠীগত, অঞ্চলগত পার্থক্য ও সমস্যা রয়েছে এবং কোন দেশের উন্নতিতে এগুলিই সবচেয়ে বড় বাঁধা। আমরা এক রকম এ সব কিছুর উর্ধ্বে। আমাদের উন্নতিতে এ ধরনের কোন বড় বাঁধা নেই। আমরা যদি উন্নতি না করতে পারি তাহলে দুনিয়ার কেউ উন্নতি করতে পারবে না। একক সত্তার দিক দিয়ে দুনিয়ায় আমরা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ জাতি। এই উপ-মহাদেশে বৃটিশের নিকট আমরা সহ বহুজাতি তাদের স্বাধীনতা হারিয়েছিল। যেমন পাঞ্জাবী, বেলুচি, পাঠান, কাশ্মীরি, শিক, তামিল, বিহারী, নাগা, মাদ্রাজী ইত্যাদি। কিন্তু কোন জাতি এ পর্যন্ত তার নিজস্ব রাষ্ট্র পায়নি। একমাত্র বাঙ্গালীরাই তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র পেয়েছে। অবশ্য আমাদের এক অংশ এখনও মুক্তি পায়নি। আমাদের মত সংগ্রামীও কেউ নয়, ভাগ্যবানও কেউ নয়। আমাদের পিছিয়ে থাকার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমরা এ পর্যন্ত আমাদের চলার পথের সঠিক দিক নির্দেশনা তৈরি করতে পারিনি। তা করতে পারলে আমাদেরকে একবার ডাইনে একবার বামে লেফট্ রাইট করতে হতো না। হরেক রকম ডাকিনী, যোগিনী, নাগিনী, হস্তিনীরা এভাবে তান্ডব নৃত্য চালাতে পারত না।

www.pathagar.com

(৩) কেউ কথা রাখেনি– কিন্তু কেন
তেঁতুল গাছে আম হয় না

আমাদের দেশে একের পর এক সরকার এসেছে। ক্ষমতার পালা বারবার বদল হয়েছে। কিন্তু জনগণের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। ক্ষমতায় যাওয়ার আগে প্রত্যেকেই বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে সে প্রতিশ্রুতি কেউ রক্ষা করতে পারেনি। অনেকেই দুঃখ করে বলেন, ''কেউ কথা রাখেনি, আয়ুব খান থেকে খালেদা জিয়া পর্যন্ত সবাই কথা দিয়েছে, কিন্তু কেউ কথা রাখেনি।" এখানে প্রশ্ন আসে, কেন কথা রাখেনি? তারা কি সবাই খারাপ লোক। তাদের সবারই কি একদম কোন দেশপ্রেম বা জনগণের উপর কোন ভালবাসা নেই। কয়দিন আগেও খালেদা জিয়ার সঙ্গে রাজপথে আমরা স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন করেছি। খালেদা জিয়া সহ আমরা সবাই কমবেশি পুলিশের লাঠিপেটা, কাঁদুনে গ্যাস খেয়েছি। নির্যাতন জেল জুলুম সহ্য করেছি। অন্তরীণ হয়েছি। কত ভাল কথা খালেদা জিয়া বলতেন। কত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কৃষকের কষ্টের কথা, শ্রমিকের দুঃখের কথা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা তিনি বলতেন। গণতন্ত্রের কথা বলতেন, পুলিশী জুলুমের কথা বলতেন, আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা বলতেন, জনগণের দুঃখ দুর্দশা ও অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলতেন। স্বাধীন স্বনির্ভর দেশ গড়ার কথা বলতেন। কিন্তু আজ দেখা যায় যে সবকিছু তিনি যেন বেমালুম ভুলে গেছেন। আজ দেখছি তিনিও পুলিশী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার হাতেও আজ রক্তের দাগ দেখতে পাই। এ পর্যন্ত যারাই ক্ষমতায় গিয়েছে প্রত্যেকের হাতই রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। রক্তের দোহাই দিয়ে ক্ষমতায় এসে সবাই রক্তে অবগাহন ক'রে গেছে। খালেদা জিয়াও এর ব্যতিক্রম নয়। এরশাদ আমলের শাসন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে কোন পার্থক্য আজ খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে পরিস্থিতির অবনতি ছাড়া উন্নতি হয়নি। অবস্থা দাঁড়িয়েছে সেই প্রবাদের মতো, ''যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ"। আসল বাস্তবতা হচ্ছে এই অবস্থায় বর্তমান কাঠামোতে এরচেয়ে খুব ভালভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তাদের যত সদিচ্ছাই থাকুক না কেন, যত চেষ্টাই করুক না কেন। আওয়ামী লীগের শাসন আমলও আমরা দেখেছি। আজ যদি ক্ষমতা বদল ক'রে আবার আওয়ামী লীগকে বা অন্য কাউকে ক্ষমতায় বসানো হয় তা'হলেও অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। খালেদা জিয়াকে ক্ষমতায় বসিয়ে জনগণ যেমন হতাশ হয়েছে, তেমনি পুনরায় আবার নতুন ক'রে একবার হতাশ হতে হবে এই যা পার্থক্য। জনগণের ভাগ্য যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। আসল কথা হচ্ছে কে দেশ শাসন করে সেটা বড় কথা নয়। কোন্ কাঠামোয় কোন্ পরিচালনাকারী নীতির ভিত্তিতে দেশ পরিচালিত হয় সেটাই বড় কথা।

www.pathagar.com

তেঁতুল গাছে তেঁতুলই হয়, আমাড়া গাছে আমড়াই হয়—আম হয় না। এমনকি আমরা নিজেরা যত ভাল কথা বলি না কেন, যত প্রতিশ্রুতিই দেইনা কেন বর্তমান অবস্থা ও কাঠামো বহাল রেখে আমরাও যদি ক্ষমতায় বসি তা হলেও এর চেয়ে খুব একটা ভাল চালাতে পারব না। যারা যত বড় কথাই বলুক না কেন এটাই খাঁটি বাস্তবতা। যেহেতু এ সমস্ত দলগুলির আমাদের নিজস্ব বাস্তবতার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করার ও কাঠামো পরিবর্তন করার মতো কর্মসূচী নেই এবং বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থেই তারা ক্ষমতায় বসে বা তাদের প্রতিনিধিত্ব করে ফলে তাদের পক্ষে স্বাধীন-স্বনির্ভর দেশ গড়ার এবং জনগণের সার্বিক মুক্তির কোন পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব নয়।

(ক) কেন আমরা এত দুর্ভাগা

লাইন ছাড়া চলে না রেলগাড়ী

এত সংগ্রামের ঐতিহ্যমন্ডিত জাতি হওয়া সত্ত্বেও, এতসব জাতীয় বীরদের আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা থাকা সত্ত্বেও এবং আমাদের এত সম্পদ (যে সব সম্পর্কে বিবরণ এর পূর্বেই দিয়েছি) থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারছি না। কেন আমাদেরকে এই অভিশাপ, বঞ্চনা ও নির্যাতন সইতে হচ্ছে। একদিকে যেমন আমরা আমাদের জনগণের বেঁচে থাকার নূন্যতম চাহিদা পূরণ করতে পারছি না, অন্যদিকে আমরা একটি সত্যিকার অর্থে স্বাধীন জাতি হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছি না। আমরা একটি ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত হয়েছি। আজ আমাদের স্বাধীনতা যেন পরের দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমাদের মতো স্বাধীনতা প্রাপ্ত অনেক দেশই আমাদের এই দশায় আজ পতিত। কোন কোন দেশ চাকচিক্যের দিক দিয়ে উন্নত হলেও তারা তাদের সাধারণ মানুষের জীবনের নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। স্বনির্ভর দেশ তারা গড়তে পারেনি। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে পারেনি। সেদিক দিয়ে কোরিয়া একটি ব্যতিক্রম। আগেই বলেছি কোরিয়া অতি পশ্চাদপদ দেশ থাকা সত্ত্বেও শুধু তার স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বকেই নিশ্চিত করেনি, তার প্রতিটি মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলি মিটিয়ে তাদের একটি সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তা দিয়েছে। এটা কি ক'রে সম্ভব হয়েছে। এর মূল কারণ হচ্ছে কোরিয়ার বাস্তবতার সাথে সম্পর্কযুক্ত তার জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী চলার পথের দিক নির্দেশনা তারা তৈরি করেছে। অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট কিম ইল সুং এর দেয়া জুচে ভাবধারার আলোকে তারা দেশটি গড়ে তুলেছে। এর সঙ্গে রয়েছে প্রেসিডেন্ট কিম ইল সুং এর মেধাবী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। একটি জাতি যদি তার চলার পথের সঠিক দিক নির্দেশনা তৈরি করতে না পারে তাহলে সে জাতি তার ভাগ্যের উন্নয়ন করতে পারে না। পরিচালনাকারী

www.pathagar.com

সঠিক আদর্শ ও নীতি নির্ধারণ করা হয়নি বলেই এতো কঠিন সংগ্রাম ও ত্যাগ -তিতীক্ষা সত্ত্বেও আমরা আমাদের জনগণের মুক্তির পথ নির্দেশনা করতে পারিনি। ফলে জনগণ নানাবিধ জাতীয়-বিজাতীয় শাসন-শোষণে নিষ্পিষ্ট হয়ে চলছে এবং সমাজ জীবন ক্রমাগত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রেলগাড়ী যেমন তার নিজস্ব লাইন ছাড়া চলতে পারে না, তেমনি একটি জাতিও তার নিজস্ব সঠিক পরিচালনাকারী নীতি ও কর্মসূচী ছাড়া ঠিকমত চলতে পারে না। জাতীয় দারিদ্রতা হতে মুক্তি পেতে, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে এবং গণ-মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক মুক্তি অর্জন করতে আজ আমাদের সবচেয়ে যা বড় প্রয়োজন তা হচ্ছে আমাদের চলার পথের সঠিক দিক নির্দেশনা--সঠিক আদর্শ ও নীতি নির্ধারণ করা। আমাদের নিজস্ব বাস্তবতায় নিজ দেশের জনগণ ও নিজস্ব সম্পদের উপর নির্ভর ক'রে এ পর্যন্ত কেউ কোন সঠিক পথ নির্দেশ করতে পারেনি বলেই আমাদের এই পরিণতি। আজ আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন গোঁড়ামিবাদ, পরাশ্রয়ীবাদ ও লেজুড়বৃত্তি পরিহার ক'রে অন্যদের অভিজ্ঞতা সামনে রেখে জনগণের প্রকৃত স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্খা পূরণের উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের সম্পদ ও জনগণের উপর নির্ভর ক'রে আমাদের বাস্তবতার ভিত্তিতে সঠিক চলার পথ নির্ধারণ করা। নিজেদের সৃজনশীল ক্ষমতা ব্যবহার ক'রে আমাদের আদর্শগত দিক নির্দেশনা ও সংগ্রামের সঠিক পথ-পন্থা ও নীতি নির্ধারণ করতে হবে। নইলে আমাদেরকে এভাবেই অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হবে, বন্ধ দুয়ারে মাথা ঠুকতে হবে। কোরিয়া যেভাবে করেছে আমরা ঢালাওভাবে সেভাবে অবশ্যই করতে পারি না। কোরিয়ার বাস্তবতা আর আমাদের বাস্তবতা অবশ্যই এক নয়। কোরিয়ার পথ আর আমাদের পথ সেকারণে এক হতে পারে না। 'পন্থার' ঢেউয়ের সঙ্গে কোরিয়ার 'টেডং' নদীর ঢেউয়ের যেমন পার্থক্য রয়েছে তেমনি আমাদের চলার পথেরও পার্থক্য রয়েছে। তবে তাদের অভিজ্ঞতা অবশ্যই আমাদের চলার পথে এক বড় পাথেয়। কিম ইল সুং এর শিক্ষাই হচ্ছে প্রতিটি দেশের বাস্তবতা, সংগ্রামের স্তর ও জনগণের মন- মানসিকতার সাথে অন্য দেশের পার্থক্য রয়েছে। ফলে যার যার পথ তার নিজেকেই তৈরি ক'রে নিতে হবে। সে শিক্ষাকে গ্রহণ ক'রে ও মানুষ সম্পর্কে তার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্ব দিয়ে আমরা আমাদের চলার পথ তৈরি করেছি। পরাশ্রয়ীবাদ ও লেজুড়বৃত্তিকে পরিহার ক'রে নিজের জনগণ ও সম্পদের উপর নির্ভর ক'রে স্বাধীন স্বনির্ভর দেশ গড়ার লক্ষ্যে এবং মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করতে আমরা মনে করি সত্যিকার অর্থে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই একমাত্র পথ। তাই আমরা সে পথের নাম দিয়েছি "**গণশাসন**"। আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি এ দেশে পিপলস্ লীগই একমাত্র রাজনৈতিক দল যার আমাদের নিজস্ব বাস্তবতার আলোকে নতুন দেশ গড়ার তথা জনগণের সকল অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব ও কর্মসূচী রয়েছে। প্রত্যেকটি তত্ত্ব ও কর্মসূচী একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ঐ দার্শনিক

www.pathagar.com

দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সামাজিক ঐতিহাসিক প্রগতির ব্যাখ্যা ও নিয়ম কানুনের ভিত্তির উপর নির্ভরশীল এবং তার ভিত্তিতেই পরিচালনাকারী নীতি নির্ধারণ করতে হয়। গণশাসনে এ ধরনের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিচালনাকারী নীতি ও কর্মসূচী রয়েছে। এদিক দিয়ে আমরা এ দেশের সকল রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একটি ব্যতিক্রম। আমরা বিশ্বাস করিনা যে শুধু জিন্দাবাদ-মুর্দাবাদ দিয়ে দেশ গড়া যায় বা শুধুমাত্র অপরের অতীত ঘাটাঘাটি ক'রে জনগণের মুক্তি নিশ্চিত করা যায়। দেশ গড়ার সঠিক রাস্তা বের করতে না পারলে দেশ গড়া যায় না। বি, এন, পি যখন আওয়ামী লীগ বা জাতীয় পার্টির অতীত সম্পর্কে সমালোচনা করে তখন দেখা যায় যে সমালোচনার প্রায় সবই সত্য। আবার আওয়ামী লীগ যখন বি, এন, পি'র সম্পর্কে বলে তখনও দেখা যায় যে সব সত্য। অর্থাৎ পরের বেলায় এরা সবাই সত্য কথা বলে, তবে নিজের বেলায় অন্যরকম। কিন্তু এতে লাভ কি জনগণের। গণমানুষের মুক্তির কর্মসূচী কোথায়? পরস্পরের বিরুদ্ধে দুই দলের অভিযোগই সত্য হলে এধরনের অভিযুক্তদের দিয়ে কি হবে তা সহজেই বুঝা যায় এবং হচ্ছেও তাই। আমরা বিশ্বাস করি গণশাসনের এই নতুন কর্মসূচী ব্যতীত আমাদের কোন মুক্তির পথ নেই। এ দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের আর কোন রাস্তা খোলা নেই।

বিঃ দ্রঃ আমার লিখিত গণশাসন বইটি এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে সাহায্য করবে।

www.pathagar.com

(৪) এ রাষ্ট্রের মালিক কে

এ রাষ্ট্রের মালিক কে— আমরা জনগণ না অন্য কেউ? এ রাষ্ট্র কে চালায়— আমাদের সরকার না অন্য কেউ? কার নির্দেশে এ রাষ্ট্র চলে, আমরা কতটুকু স্বাধীন, কে আমাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, আমাদের বাঁচা-মরা কার হাতে, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কতটুকু মূল্য আছে তা ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা সোনালী দিনের আশায় বারবার সরকার বদলাচ্ছি। কিন্তু প্রত্যেকটি সরকার কেন ব্যর্থ হচ্ছে, কোন সরকারই কেন কোন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারছে না তার কারণ খুঁজে দেখা দরকার। আমাদের সরকার যদি স্বাধীন স্বনির্ভর দেশ গড়তে চায়, জনগণের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে চায়—তাহলে কি তারা তা পারে। আমরা বলি তা তারা ইচ্ছা করলেও পারে না। কারণ তাদের হাত-পা বাঁধা। তারা আসলে অসহায়। আসলে তাদের নিয়ন্ত্রণে বলতে গেলে কিছুই নেই। আমাদের রাজনীতি অর্থনীতির মালিক, না আমাদের জনগণ—না আমাদের সরকার। ক্ষমতার নাটাই অন্যের হাতে থাকায় আমরা ও আমাদের সরকার তাদের প্রয়োজন ও ইচ্ছায় আগাই পিছাই বা ঘুরপাক খাই।

(ক) বিদেশী সাহায্য বিদেশীরাই খায়

এ এক সর্বনাশা নেশা

আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে বিদেশী সাহায্যের ভূমিকা খুবই ব্যাপক। রাষ্ট্রীয় বাজেটের ৮০ ভাগই বিদেশী সাহায্য নির্ভর। এ সাহায্য ছাড়া এক পা'ও চলার উপায় নেই। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি যারা ক্ষমতায় যায় অথবা ক্ষমতায় ব'সে যারা দল গঠন করে তারা সুবিধাভোগী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। ফলে তারা ঐ শ্রেণীর স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়বৃত্তি করতে বাধ্য হয়। সাম্যাজ্যবাদী শক্তির খবরদারিতেই এদেরকে রাষ্ট্র চালাতে হয়। দেশীয় এই সুবিধাভোগী শ্রেণীর স্বার্থেই ঢালাওভাবে বিদেশী সাহায্য আনা হয় এবং এভাবে সাহায্য গ্রহণের মাধ্যমে দেশকে সম্পূর্ণভাবে বিদেশের কাছে বন্ধক দিয়ে দেয়া হয়েছে। যে বিপুল বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে তা যদি আমাদের এতটুকু কাজে আসত তা'হলে দেশের অবস্থা এরকম থাকার কথা নয়। স্বাধীনতার পর থেকে জুন '৯২ পর্যন্ত আমরা ২৪১৯ কোটি ডলার— যা বর্তমান বাজার দরে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা— বিদেশী ঋণ ও সাহায্য পেয়েছি। অর্থাৎ যে শিশু আজ জন্ম গ্রহণ করছে সেও ৮০০০/ টাকার বেশি ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে পৃথিবীতে আসছে। আমাদের কি অধিকার আছে ভবিষ্যত বংশধরদের এভাবে

www.pathagar.com

দেনার দায়ে আবদ্ধ করা। এ বিরাট অঙ্কের সাহায্য কোন কাজে আসলে আমরা এতদিনে সোনার বাংলা গড়তে পারতাম। অথচ এত সাহায্য নিয়েও আমাদের অর্থনীতির বৈশিষ্ট হচ্ছে আমাদের মাথা পিছু আয় মাত্র ১৭০ ডলার, ৮০ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে, ৬০ ভাগ লোক অপুষ্টিতে ভুগছে, ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ১৯৬১ সনের ১৮ ভাগ থেকে বেড়ে বর্তমানে প্রায় ৭০ ভাগে পৌঁছেছে। এক তৃতীয়াংশ কর্মক্ষম লোকই বেকার, মাত্র ২২ ভাগ লোক অক্ষরজ্ঞান রাখে, ৭০ ভাগ লোক একরকম বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ ফুটপাতে বস্তিতে অসহনীয় জীবন যাপন করে। এত সাহায্য নিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার পরিবর্তে প্রতিবছর বাজেটের জন্য আরো বেশি ক'রে বিদেশের কাছে হাত পাততে হয়। নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার কথা আজ কল্পনাও করা যায় না।

বিদেশী সাহায্য হচ্ছে নেশার মতো। যত বেশি নেয়া হবে আরও তত বেশি প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ জাতীয়ভাবে আমরা নেশাখোরের মতো হয়ে পড়েছি। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ধরা যাক বাংলাদেশ প্রতি বছর ১০০০ ডলার ক'রে ঋণ গ্রহণ শুরু করল। শর্ত হচ্ছে মাত্র শতকরা ৫ ভাগ অর্থাৎ প্রতি ১০০ ডলারে বৎসরে মাত্র ৫ ডলার সুদ দিতে হবে এবং আসল ১০০০ ডলার ২০ কিস্তিতে ২০ বৎসরে শোধ করতে হবে। তাহলে শতকরা ৫ ডলার হারে বৎসর শেষে এক হাজার বা দশ শত ডলারে সুদ দিতে হবে ৫×১০ = ৫০ ডলার এবং আসল ১০০০ ডলার ২০ বৎসরে শোধ করতে হলে বৎসর শেষে কিস্তি দাঁড়াবে ১০০০÷ ২০ = ৫০ ডলার। অর্থাৎ বৎসর শেষে সুদ ও আসল মিলিয়ে শোধ করতে হবে সুদ ৫০ + আসলের কিস্তি ৫০ = ১০০ ডলার। দ্বিতীয় বৎসরে আরো ১০০০ ডলার ঋণ গ্রহণ করা হলো। তা'হলে দ্বিতীয় বৎসর শেষে একই হিসেবে শোধ করতে হবে প্রথম বৎসরের ঋণের ১০০ ডলার এবং দ্বিতীয় বৎসরের ঋণের ১০০ ডলার অর্থাৎ ২০০ ডলার। এভাবে তৃতীয় বৎসর শেষে ৩০০, চতুর্থ বৎসর শেষে ৪০০ এবং এভাবে চলতে চলতে ১০ম বৎসরে নেয় পুরো ১০০০ ডলারই বৎসর শেষে সুদ ও আসলের কিস্তি শোধ করতে ব্যয় হবে। অর্থাৎ ঋণ ১০০০ ডলার নিলেও হাতে কিছুই আসল না। এর পরের বৎসর আরো বেশি ঋণ করতে হবে শুধু পূর্বের ঋণের সুদ ও কিস্তি শোধ করতে। অথচ প্রত্যেক বৎসর ১০০০ করে ১০ বৎসরে নেয়া ১০ হাজার ডলারের মধ্যে আসল শোধ হয়েছে প্রথম বৎসরে ৫০, দ্বিতীয় বৎসরে ১০০, তৃতীয় বৎসরে ১৫০ এভাবে দশম বৎসরের ৫০০ অর্থাৎ মোট ২৭৫০ ডলার এবং বাকি ৭২৫০ ডলার আসল রয়ে গেছে আমাদের ঘাড়ের উপর, যা সুদ সহ ফেরত দিতে হবে। এই কারণেই এখন বাংলাদেশকে প্রতি বছর ক্রমশ: আরো বেশি ক'রে ঋণ গ্রহণ করতে হচ্ছে। কিন্তু হাতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

বিদেশী সাহায্য গ্রহণের ভিক্ষা মনোবৃত্তি সমস্ত জাতির জন্য এক বিরাট কলঙ্ক। উন্নত দেশগুলি তাদের শিল্প ও কৃষিতে উৎপাদিত পণ্য তথাকথিত সাহায্যের নামে আমাদের মতো দেশগুলিতে বিক্রি ক'রে থাকে। যার অধিকাংশই ফিনিস্‌ড গুডস্‌, ভোগ্যপণ্য ও বিলাস সামগ্রী। উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কহীন মধ্যসত্ত্ব ভোগীদার শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকার এই ফল। এভাবে অনবরত পণ্য আমদানীর ফলে জাতীয় শিল্পের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। আমদানী বিকল্প কোন শিল্প এখানে ঠিকমতো গড়ে উঠতে পারছে না। আমাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ব্যবহার্য দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় অধিকাংশ সামগ্রী হয় আমদানীর মাধ্যমে পেয়ে থাকি, না হয় দেশে অবস্থিত বহুজাতিক শিল্পের মাধ্যমে পেয়ে থাকি। এই বিদেশী সাহায্য দেশের শতকরা ৯০ ভাগ সাধারণ মানুষের কোন উপকারে আসে না। মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী শ্রেণী যারা রাষ্ট্র ও সমাজ জীবন নিয়ন্ত্রণ করে তাদের স্বার্থেই এই সাহায্য আনা হয়ে থাকে এবং এর মাধ্যমে তারা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতে থাকে। আর এই সাহায্যের নামে বিদেশীরা আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র ও সরকারের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চালিয়ে থাকে। যেমন যে বাজেট পেশ করা হয় তাতে গ্যাসের দাম, সারের দাম, রেশনের দাম, বিদ্যুৎ রেট, পানির রেট, রেল ভাড়া ইত্যাদি কত বাড়বে; টাকার মূল্যমান কখন কি হারে কমাতে হবে তা বিশ্বব্যাংক এবং আই, এম, এফ, এর কর্মকর্তারা ঠিক ক'রে দেয়। মহাজনের ঋণে যখন খাতকের বাড়ীঘর বন্ধক হয়ে যায় তখন মহাজনের কথার বাইরে তার যাওয়া সম্ভব নয়। ফলে তাদের ঐ সব নির্দেশ আমাদেরকে মানতে হয়। আমাদের মন্ত্রীদের প্রায়ই ওদের ধমক খেতে হয়। এ ধরনের সরকারগুলির পক্ষে এই বিষচক্র থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব নয়। ফলে ইচ্ছা অনিচ্ছায় তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া এদের কোন উপায় থাকে না। বৈদেশিক সাহায্যের অর্থই হচ্ছে পরনির্ভরশীলতা। একজন ব্যক্তির জীবনে একজন রক্তচোষা মহাজনের যে ভূমিকা জাতীয় জীবনে দাতা দেশগুলি সে ভূমিকা পালন ক'রে থাকে। বিদেশী সাহায্য গ্রহণ ক'রে আমাদের এবং আমাদের বংশধরদের বন্ধক রাখা হচ্ছে ধনী দেশগুলির কাছে। তা'ছাড়া এই ভিক্ষামূলক মনোবৃত্তি আমাদেরকে এক অবমাননাকর অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে। প্রতিবছর আমরা কয়েকশত কোটি ডলার বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করছি। এরদ্বারা সাম্রাজ্যবাদের অবাধ শোষণের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে আমাদের দেশ। মুষ্টিমেয় এলিট শ্রেণীর হাতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্যই এই বিদেশী সাহায্য আনা হচ্ছে। আমরা মনে করি উন্নয়নের ভিত্তি কখনো বিদেশী সাহায্য হতে পারে না। কারণ এতে স্বাধীনভাবে স্বনির্ভর উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমাদের স্বাধীনতা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে হারিয়ে যায়। একদিকে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি বাড়ায়, অন্যদিকে গরীব মানুষ আরো নিঃস্ব হয়। বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে

www.pathagar.com

একহাতে সাহায্য দিয়ে অন্যহাতে বাণিজ্যিক ঘাটতি সৃষ্টি ক'রে আমাদের নিকট হতে আরো সম্পদ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে নিয়ে যাওয়া হয়। গণশাসন প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে স্বাধীন স্বনির্ভর দেশ গড়ে তোলা এবং তা না করতে পারলে দেশের মানুষকে বাঁচানো সম্ভব নয়। তবে ইচ্ছা করলেই এই জাল ছিন্ন ক'রে বের হয়ে আসা যায় না। একমাত্র জনগণকে সম্পৃক্ত ক'রে তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই গণশাসনের স্বাধীন স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব। অন্য অর্থে সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় দেশীয় সুবিধাভোগী শ্রেণীর হাত থেকে জনগণের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা আনার মাধ্যমেই গণশাসনের স্বাধীন স্বনির্ভর দেশ গড়ে তোলা সম্ভব এবং পিপলস্ লীগ তা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

(খ) বহুজাতিকের খাঁচায় দেশীয় শিল্প বন্দী

বিদেশী সাহায্যের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের পণ্য আমাদের দেশে রপ্তানি ক'রে থাকে। এর বাইরে এখানকার সস্তা শ্রম ও কাঁচামাল ব্যবহার ক'রে যদি কোন লাভজনক শিল্প গড়ে তোলা যায় তবে তা বিদেশীরাই ক'রে থাকে। তারা নামমাত্র মূলধন নিয়ে আমাদের দেশে এসে নিজেদের নাম ভাঙ্গিয়ে সরকার ও অর্থ সরবরাহকারী সংস্থাগুলির উপর চাপ সৃষ্টি ক'রে এখানে শিল্প গড়ে তোলে এবং এর মাধ্যমে আমাদের সম্পদ অনবরত লুটে নিয়ে যায়। একদিকে রপ্তানি প্রক্রিয়া অঞ্চল গড়ে তোলার মাধ্যমে বিদেশীদের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, অন্যদিকে এর বাইরে দেশের অভ্যন্তরে বহুজাতিক সংস্থার শিল্প সমূহ ইতিমধ্যেই বহুদূর শিকড় গেড়ে বসেছে। আমাদের ঔষধ শিল্পের প্রায় ৭০ ভাগ, চা শিল্পের ৬০ ভাগ, সিগারেট শিল্পের ৮০ ভাগ, পাদুকা শিল্পের ১৫ ভাগ, অক্সিজেনের ১০০ ভাগ বহুজাতিকের নিয়ন্ত্রণে। এছাড়া আমাদের হোটেল ব্যবসা, সাবান শিল্প, কোল্ড ড্রিংকস্, কসমেটিকস্, বৈদ্যুতিক পাখা বাল্ব ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, সেলাই মেশিন, রেডিও টি-ভি ভিসিপি এসেম্বিলিং ময় টুথপেষ্ট, তেল, শ্যাম্পু ইত্যাদি সবই এখানে বহুজাতিকের কারখানায় উৎপাদিত হয়। অথচ দেশে আমাদের নিজস্ব খাতে এসব শিল্প বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু দেশীয় শিল্পগুলি স্বভাবতই এ সমস্ত দৈত্যাকার বহুজাতিকের নিকট অসম প্রতিযোগীতার সম্মুখীন হয়ে অনবরত মার খাচ্ছে। এছাড়াও ১০/১২ টি ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী রয়েছে বহুজাতিকের। যারা একদিকে আমাদের সম্পদে স্ফীত হচ্ছে, দেশীয় ব্যাঙ্ক-বীমার ক্ষতি সাধন করছে, অন্যদিকে অন্যান্য বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে চাঙ্গা করছে। তারা নিয়োজিত রয়েছে আমাদের সম্পদ পাচার করতে। এসব বহুজাতিক কোম্পানীগুলিকে সহজেই চেনা যায়। যদিও তারা বর্ণচোরার মতো কাজ করার চেষ্টা ক'রে থাকে। এদের অধিকাংশের নামের শেষে আছে ''বাংলাদেশ লিমিটেড'' যেমন ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেড, ফিলিপস্ বাংলাদেশ

www.pathagar.com

লিমিটেড, লিভার ব্রাদার্স বাংলাদেশ লিমিটেড ইত্যাদি যাদের হেড অফিস অন্যত্র। এ ধরনের বাংলাদেশ লিমিটেড কিছু রাজনৈতিক দলও আমাদের দেশে রয়েছে। তাদেরও হেড অফিস অন্যত্র। এগুলিও এক ধরনের বহুজাতিক রাজনৈতিক দল। এ সব দলের নামের প্রথমে ''বাংলাদেশ" কথার পরিবর্তে "বাংলাদেশের" এই কথাটি বা শেষে ''বাংলাদেশ'' লেখা থাকে যেমন ''বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি", "বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল" বা "জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ"। এদের সবাইকে নিয়ন্ত্রিত হতে হয় বাইরের থেকে। আবার এ ধরনের নাম না নিয়েও কিছু বিদেশী নিয়ন্ত্রিত দল আছে। তাদের কেউ ওয়াশিংটন পন্থী, কেউ দিল্লি পন্থী, কেউ পাকিস্তান পন্থী, কেউ পিকিং পন্থী, কেউ লিবিয়া পন্থী ইত্যাদি। এদের হেড অফিসে যখন গোলযোগ দেখা দেয় তখন এরাও গোলযোগে পড়ে নিজেরাই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির (সি পি বি'র) যে অবস্থা।

বহুজাতিকের ও বিদেশী পণ্যের দাপট আমাদের দেশে কত বেশি তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। রেডিও, টেলিভিশন বা রাস্তার পার্শ্বের হোর্ডিং এর বিজ্ঞাপনের দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে যত বিজ্ঞাপন দেয়া হয় বা আছে তার প্রায় ৭০–৭৫ ভাগ বিজ্ঞাপন হয় আমাদের দেশে তাদের রপ্তানি করা পণ্যের অথবা এখানে বহুজাতিকের শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের। আমাদের প্রচার মাধ্যমগুলি কি সুন্দরভাবে তাদের সেবায় নিয়োজিত। আমাদের ছেলেমেয়েরা ওদের পণ্যের বিজ্ঞাপনের মডেল হয়। আমাদের মতো দেশে এ ধরনের বহুজাতিকের শিল্প আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে তীব্র করার মাধ্যমে একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি ক'রে আমাদের সম্পদ অনবরত পাচার ক'রে নিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের নিজস্ব শিল্প বিকাশের পথ রুদ্ধ ক'রে রেখেছে।

বিঃ দ্রঃ বিদেশী সাহায্যের নামে এবং বহুজাতিক সংস্থা ও শিল্পের মাধ্যমে আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সামাজ্যবাদীরা কি অসহনীয় শোষণ ও লুটতরাজ চালাচ্ছে সে সম্পর্কে আমি বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে বিষদভাবে লিখেছি আমার লিখা "বৈদেশিক সাহায্য— বহুজাতিক সংস্থা এবং তৃতীয় বিশ্ব ও বাংলাদেশ" নামক বইতে।

(গ) চোরাচালানী

এভাবে বন্ধ করলে অর্থনৈতিক জীবনে ধ্বস নেমে আসবে

আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে চোরাচালানী একটি বড় ফ্যাক্টর। এটা আমাদের শিরোপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবে অর্থনৈতিক জীবন চলতে পারে না। কিন্তু চোলাচালানী গায়ের জোরে বন্ধের জিনিস নয়। বহু হংকার দেয়া হয়েছে এর বিরুদ্ধে। আর্মি, পুলিশ, বি–ডি–আর নামানো হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেড়ায় ক্ষেত খেয়েছে। এ পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষকে জেলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তবুও চোরাচালানী বেড়েই চলেছে। কারণ সঠিক অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

কর্মসূচী না নিয়ে এটা বন্ধ করা যায় না। এ সম্পর্কে এখানে আরও দু'একটি কথা বলতে হয়। চোরাচালানী আজ আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। It has become a part of our economy. আজ অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে সত্যি সত্যি যদি হঠাৎ ক'রে চোরাচালানী বন্ধ ক'রে দেয়া হয়। তা'হলে অর্থনৈতিক জীবনে এক বিরাট ধ্বস নেমে আসবে। প্রায় এক কোটি লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চোরাচালানীর সাথে জড়িত। বহু নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের মূল উৎস হচ্ছে চোরাচালানী—যা না পেলে মানুষের জীবনে দুর্ভোগ বেড়ে যাবে। তেমনিভাবে আমাদেরও বহু পণ্য চোরাচালানীর মাধ্যমে রপ্তানি হয়ে থাকে। বিকল্প অর্থনৈতিক কাঠামো না গড়ে তুলতে পারলে চোরাচালানী বন্ধ করা সম্ভব নয়। চোরাচালানী কাকে বলে সে সূত্র নিয়েও অনেকের সঙ্গে আমাদের মতভেদ রয়েছে। একই জিনিস রাষ্ট্রের মাধ্যমে আমদানী-রপ্তানি না ক'রে বেসরকারীভাবে রাষ্ট্রের অজ্ঞাতে আমদানী-রপ্তানি হলেই তা চোরাচালানী হয়। কারণ এতে রাষ্ট্র তার আমদানী-রপ্তানির কর পায় না। তবে জনগণ এ কর প্রদান না করায় কিছুটা সস্তায় জিনিস পায় বলে তারা চোরাচালানীর মাল কিনতেই আগ্রহী হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সরকারের উচ্চপদে আসীন ব্যক্তিরা যে জিনিস আমাদের প্রয়োজন নেই বা দেশে যার শিল্প রয়েছে সে জিনিস আমদানী ক'রে থাকে। অর্থাৎ বৈধ পথে আমদানী হলো এবং রাষ্ট্র কিছু কর পেল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় খাতে এই অপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য বিরাট অংকের বিদেশী মুদ্রা বেরিয়ে গেল, অথবা বিদেশের কাছে দেশের দেনা হলো এবং দেশীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হলো। রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা যখন এ ধরনের কর্মটি করলো তখন তারা চোরাচালানীদের থেকেও নিকৃষ্ট পর্যায়ে পড়ে গেল এবং তারা রাষ্ট্রের অনেক বেশি ক্ষতি করল। চোরাচালানকারীরা অন্তত রাষ্ট্রীয় খাতকে দায়বদ্ধ করে না বা অপ্রয়োজনীয় জিনিস আমদানী করে না। কিন্তু রাষ্ট্রের এ সমস্ত কর্মকর্তারা তা ক'রে থাকে। এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় জিনিস আমদানীর বেশ কিছু তথ্য আমার লিখিত "বৈদেশিক সাহায্য-বহুজাতিক সংস্থা এবং তৃতীয় বিশ্ব ও বাংলাদেশ" নামক বইটিতে দেয়া আছে। চোরাচালানীর মাধ্যমে মাল আসার ফলে দেশীয় শিল্প মার খায় এটা সত্য। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্মকর্তাগণ যখন এ ধরনের মাল আমদানী ক'রে এ জাতীয় দেশীয় শিল্পগুলির অগ্রগতিতে বাঁধা সৃষ্টি করে তখন তারা নিজেরাও কি চোরাচালানীদের চেয়ে ভাল অবস্থায় চিহ্নিত হতে পারে? নিশ্চয়ই নয়। এদেরকেও আমরা চোরাচালানকারী হিসেবে চিহ্নিত করি এবং সাধারণ চোরাচালানকারীদের থেকে এরা আরো বেশি ক্ষতিকারক। আবার চোরাচালানকারীদের মূলহোতা এরা হয় নিজেরাই অথবা এদের লোকজনই যারা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের ছত্রছায়ায় চোরাচালানী ক'রে থাকে। এদেরকে আমরা কি বলব? আমদানী বিকল্প শিল্প না গড়তে পারলে চোরাচালানী বন্ধ হতে পারে না। অথচ এখানে আমলাতন্ত্রের বেড়াজাল পেরিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠা করা কি দুরুহ ব্যাপার তা কেবল

www.pathagar.com

ভুক্তভোগীরাই জানেন। আবার শিল্প প্রতিষ্ঠা হলেও তার কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের উপর এমন হারে কর বসান হয় যাতে চোরাচালানীর মালের সাথে এগুলি প্রতিযোগীতায় টিকতে না পারে। এই একটি কারণেই ভারতীয় শাড়ীর প্রচলন এতো বেশি আমাদের দেশে। চোরাচালানীরা নিজেদের ব্যবসায় একটা ভারসাম্য বজায় রাখে। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় খাত আমদানি-রপ্তানিতে কোন ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি বলেই আজ আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার উপর। এসব কারণে এক কথায় বলতে পারি রাষ্ট্রের উপর তলায় সবচয়ে বড় বড় চোরাকারবারীরা বসে আছে, আর এর বোঝা বইতে হয় সাধারণ জনগণের। চোরাচালানের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে দেশীয় শিল্পের বিকাশ এতে রুদ্ধ হয়। ফলে কর্মসংস্থান ঠিকমতো হয় না এবং অপর ক্ষতি হচ্ছে যে এখান থেকে মাল নিয়ে তাদের পাওনা শোধ না হলে চোরাবাজার থেকে পাউন্ড-ডলার কিনে নিয়ে যায়। এতে জাতির সর্বনাশ হয় সন্দেহ নেই। রাষ্ট্রের ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যমূলক নীতির কারণেই চোরাচালানী টিকে ছিল, আছে এবং এ অবস্থা বজায় থাকলে তা থাকবে। পুঁজিবাদী সব দেশেই চোরাচালানী আছে ও থাকবে। গণশাসনের স্বাধীন স্বনির্ভর অর্থনীতি না গড়তে পারলে চোরাচালানী বন্ধ করা সম্ভব নয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সঠিক অর্থনৈতিক পলিসি না নিলে চোরাচালানী কিছুতেই বন্ধ করা সম্ভব নয়।

(ঘ) জাতীয় শিল্প বিকাশের সুযোগ কোথায়

আমাদের জাতীয় শিল্পের আশানুরূপ বিকাশ না হওয়ায় অর্থনৈতিক জীবনে প্রবৃদ্ধি ঠিকমত হচ্ছে না বলে আমরা হা-হুতাশ ক'রে থাকি। কিন্তু আমাদের সীমিত বাজারে আমদানীকৃত পণ্য, বহুজাতিক শিল্পের পণ্য এবং চোরাই মালের সামনে আমাদের জাতীয় শিল্প বিকাশের সুযোগ কোথায়? এমনিতেই দেশের প্রায় ৭০ ভাগ লোক ভূমিহীন হওয়ায় বাজার অত্যন্ত সীমিত। কারণ এসব ভূমিহীনদের পক্ষে শিল্পে উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার করা সম্ভব নয়। আর দেশী-বিদেশী স্বার্থান্বেষী মহলের চাপে পড়ে সরকার নিজেই জাতীয় শিল্প বিকাশের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হলে একদিকে যেমন তথাকথিত বিদেশী সাহায্যের নামে ঢালাওভাবে পণ্য আমদানী বন্ধ করতে হবে, বহুজাতিকের কালো হাত হতে দেশীয় শিল্পগুলিকে রক্ষা করতে হবে, চোরাই মালের সঙ্গে প্রতিযোগীতা বন্ধের ব্যবস্থা নিতে হবে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা হ্রাস করার বাস্তব সম্মত ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে তেমন শিল্প গড়ার সুযোগ ঠিকমতো সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করতে হবে।

শিল্প গড়ার স্বার্থে শিল্পখাতে ব্যাঙ্কের সুদ যেখানে অনেক দেশেই মাত্র ৩-৫ ভাগ সেখানে আমাদের দেশে ১৮-২০ ভাগ চক্রবৃদ্ধি সুদ দিয়ে

www.pathagar.com

কোনভাবেই লাভজনকভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ধরুন আপনি ১ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে একটি শিল্প স্থাপন করলেন। স্বভাবতই এই শিল্পটি দাঁড়াতে ৩/৪ বৎসর সময় লাগবে। কিন্তু এর মধ্যেই সুদ দাঁড়িয়ে যাবে ৮০/৯০ লক্ষ টাকা। কিভাবে ব্যবসা থেকে এই বিরাট সুদ ও আসল শোধ ক'রে লাভজনকভাবে আপনার শিল্প চালাবেন। চক্রবৃদ্ধি সুদ আমাদের উৎপাদনমুখি অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিশেষ করে নাজুক কৃষি ও শিল্প সেক্টরকে কিভাবে দিনের পর দিন কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে তার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মোঃ খালেকুজ্জামান। তিনি হিসাব ক'রে দেখিয়েছেন যে, যদি কেউ ১৫% চক্রবৃদ্ধি সুদে ১ (এক) টাকা ঋণ নেয়, তবে ১০০ বছরে তা সুদে-আসলে দাঁড়াবে ১১,৭৪,৩১৩ (এগার লক্ষ চুয়াত্তর হাজার তিনশত তের) টাকাতে। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি অবিশ্বাস্য মনে হবে। কিন্তু ব্যাপারটি সত্যিই তাই। অথচ ১৫% সরল সুদে ১ (এক) টাকা ১০০ বছরে সুদে আসলে দাঁড়াবে মাত্র ১৬ টাকায়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় একটি পণ্য বিদেশ থেকে আমদানী করলে যে শুল্ক দিতে হয় ঐ জিনিস দেশের কারখানায় উৎপাদন করতে কাঁচামাল ও অন্যান্য জিনিস আমদানীতে কয়েকগুন বেশি শুল্ক দিতে হয়। এতে কিভাবে দেশীয় শিল্পে উৎপাদন সম্ভব। একইভাবে বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিফোন ইত্যাদির হারও যৌক্তিকভাবে নামিয়ে আনতে হবে। অন্যায় ও অতিরিক্ত কর প্রদান থেকে রেহাই দিতে হবে। এসব করলেই জাতীয় শিল্পের বিকাশ সম্ভব। অন্যথায় এভাবেই হা-হুতাশ ক'রে যেতে হবে।

আসলে বর্তমান কাঠামোয় জাতীয় শিল্পের বিকাশ সম্ভব নয়। কারণ আমলা-মুৎসুদ্দী পুঁজি হচ্ছে আমাদের অর্থনীতির মূল পরিচালিকা শক্তি। এদের খোলস ভেদ করে জাতীয় পুঁজি এখানে বিকাশের সুযোগই করতে পারছে না। আমলা-মুৎসুদ্দী নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে জাতীয় পুঁজি তথা জাতীয় শিল্প বিকাশ লাভ করতে পারে না। এরপর আছে শ্রমিক অসন্তোষের সমস্যা। এখানে না শ্রমিক না মালিক কেউই শান্তিতে নেই। এ ধরনের কাঠামোতে শ্রমিকদের বাঁচানোর কোন উপায় নেই। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা ক'রে শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে। এর জন্য আমাদের বাস্তবতায় ভিন্ন রাস্তা গ্রহণ করতে হবে। এর বাইরেও আছে জনগণকে সম্পৃক্ত ক'রে শিল্পের বিকাশ ঘটানোর বিষয়টি। মাত্র কয়েকটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যা করা সম্ভব, সে সম্পর্কে সময়মত বক্তব্য দেয়া হবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি জনগণকে সম্পৃক্ত ক'রে শিল্প গড়ার সঠিক কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারলে শিল্প ক্ষেত্রে এক অকল্পনীয় বিপ্লব সমাধা হবে।

www.pathagar.com

(ঙ) দ্রব্যমূল্য ও অসহায় সরকার

অরণ্যরোদনে লাভ কি

আমরা সবসময়ই দ্রব্যমূল্য কমানোর জন্য চিৎকার ক'রে থাকি। সরকারও মাঝে মাঝে হুমকি দিয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে নিত্যব্যবহার্য অধিকাংশ পণ্য আসে তথাকথিত বিদেশী সাহায্যের নামে বিদেশ থেকে এবং যেখানে দেশে অবস্থিত অধিকাংশ বড় বড় শিল্প কারখানার মালিক হচ্ছে বহুজাতিক সংস্থা এবং যেখানে বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ আমাদের বাজেট ঠিক করে দেয়— গ্যাস, রেশন, সার, পানি, বিদ্যুৎ, রেলভাড়া ইত্যাদির দাম নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে, সেক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতাতো তাদের হাতেই। ওদের চাল আসলে বাজারে চালের দাম কম থাকে, না আসলে বেড়ে যায়। চোরাচালানীর মাধ্যমে বিদেশী মাল আসলে বাজার ঠিক থাকে, নইলে ত্রাহী অবস্থা। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সামনে আসলে আমাদের সরকারগুলি নিতান্তই অসহায়। সরকারের হাতে কতটুকুই বা আছে। এ ধরনের সরকারের নিকট দ্রব্যমূল্য কমানোর দাবী আর অরণ্যেরোদন একই কথা। কোন সরকার না চায় দেশের মানুষ সস্তায় জিনিসপত্র পাক। মানুষ খেয়ে-পরে শান্তিতে থাক। সরকারকে বিরক্ত কম করুক। কিন্তু ওদের হাত-পা বাঁধা। দোষ দিয়ে লাভ নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে আমাদের অর্থনীতিকে উদ্ধার করতে না পারব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পক্ষে স্বাধীন-স্বনির্ভর দেশ গড়া সম্ভব নয় এবং জনগণের ভাগ্য উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক জীবনে স্বস্তি দেয়া সম্ভব নয়। এর জন্য জনগণকে সচেতন ক'রে সংগঠিত করা আজকে আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ। প্রেসিডেন্ট কিম ইল সুং কোরিয়ার জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে সঠিক পরিচালনাকারী নীতি নির্ধারণ ক'রে স্বাধীন স্বনির্ভর দেশ গড়তে পেরেছেন বলেই সে দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন করা সম্ভব হয়েছে। আমরাও তাই গণশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাধীন স্বনির্ভর দেশ গড়ে গণমানুষের জীবনে স্বস্তি আনতে বদ্ধপরিকর।

(চ) আমাদের ধনীদের উত্থান বিকাশ ও চরিত্র

আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে ধনীদের প্রভাব ব্যাপক। ১০ ভাগ ধনী ব্যক্তি দেশের ৬০ ভাগ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রের সকল কর্মকান্ড ও নীতি আবর্তিত হয় এইসব ধনীদের স্বার্থকে কেন্দ্র করেই। বিদেশীরা যে শোষণ করে তা'ও মূলত এদের মাধ্যমেই ক'রে থাকে। পুরো জাতীয় অর্থনীতিকে এরাই নিয়ন্ত্রণ করে। এরাই যেন আমাদের বাপ-মা। কিন্তু পাশাপাশি যদি তাকাই তবে দেখতে পাই ধনীদের কর্মকান্ড। তাদের একটি পোষা কুকুর যে খাবার পায় তা এদেশের বহু মানুষ জীবনে চোখে দেখেনি। ওরা সুইজারল্যান্ডের ব্যাঙ্কে টাকা জমায়, বাজার করতে সিঙ্গাপুর-ব্যাংকক যায়। প্রতিযোগীতা করে ঈদের হাটে গরু

www.pathagar.com

কেনে। সোনারগাঁ, শেরাটনে জন্মদিন পালন করে। তাদের এক রাতের ফুর্তির খরচ অকল্পনীয়। এ গরীব দেশে ওরা যে অপচয় করে তা ক্ষমার অযোগ্য। আবার অন্যদিকে মানুষের ভোগের একটি সীমা থাকে, ইচ্ছা করলেই কেউ মাত্রাতিরিক্ত খেতে পারে না, পরতে পারে না, তথা ভোগ করতে পারে না। ধনীরা যে সম্পদ কুক্ষিগত করে তার সব যে তারা ভোগ করতে পারে তা নয়। তারা পরের গ্রাস কেড়ে নিজ দখলে রেখে নিজেও খেতে পারে না কাউকে খেতেও দেয় না। আসলে ওরা অপচয়ই বেশি করে। বলা হয়ে থাকে একজন ধনী দশ হাজার লোকের গ্রাস লুটে নেয়। ওরা আমাদের হাড়-মাংস চিবিয়ে খাচ্ছে। পশুপাখির মধ্যে যে সহমর্মিতা আছে আমাদের ধনীদের মধ্যে তাও নেই। আসলে এ দেশের ধনীরা সম্পদের নেশায় মানবিক গুণাবলী হারিয়েছে। কিন্তু এদেশের ধনীরা আকাশ থেকে পড়েনি। খোঁজ নিলে দেখা যাবে কয়েক দশক আগেও এদের কারোই তেমন কিছু ছিল না। এদের প্রথম গ্রুপটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ও ৪৩ এর দুর্ভিক্ষের সুযোগে বৃটিশের পা চেটে এ দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে সম্পদ সৃষ্টি করেছে। এরাই আমাদের আদি ধনী। দ্বিতীয় গ্রুপের অভ্যুত্থান ঘটে পাকিস্তান আমলে। সরকারের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত থেকে এদের একদল ক্ষমতার অপব্যবহার ক'রে পাকিস্তানী শোষক গোষ্ঠীর যোগ-সাজসে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছে। অন্য দলটি যারা সরাসরি ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত ছিল না, তারা রাষ্ট্রীয় আমলাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর তাবেদারী ক'রে নানাবিধ ফটকাবাজী পন্থায় অর্থ গড়েছে। ডঃ আবদুল্লাহ্ ফারুক দেখিয়েছেন পাকিস্তান আমলের ৭৩ শতাংশ ধনী ব্যক্তি কোন না কোন ভাবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে ধন-সম্পদ গড়ে তুলছে। তৃতীয় গ্রুপটির উদ্ভব স্বাধীনতার পর। এরা নানা পন্থায় মন্ত্রী মিনিষ্টার আমলা তথা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বা সরকারী উচ্চপদে থেকে অবৈধ পন্থায় অথবা ক্ষমতাসীন দলের লেজুড়বৃত্তি ক'রে খুব ছোট থেকে লাফ দিয়ে বড় ধনীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এদের বিকাশ আওয়ামী লীগ আমলে, বি এন পি আমলে, জাতীয় পার্টি আমলে। এমনকি খালেদা জিয়ার আমলেও এ ধরনের লোকের ধনী হওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এদের সবার জীয়নকাঠি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করে। সামগ্রীক বিচারে এদের পুঁজিকে আমলা-মুৎসুদ্ধি পুঁজি নামে অভিহিত করা চলে। এদের সকলের আরেকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এদের ''পরগাছা-লুটেরা'' চরিত্র। এদের উপর ভিত্তি ক'রে জাতীয় পুঁজিবাদের বিকাশ সম্ভব নয়। পাকিস্তান আমলের ২২ পরিবার তাড়িয়ে আজ আমরা ২২ হাজার পরিবার সৃষ্টি করেছি। এদের কারো অর্থই সৎ উপার্জনে নয়। কোন ধনীর অর্থই সৎ পথে অর্জিত হতে পারে না। বলা হয়ে থাকে প্রত্যেক সম্পদের পিছনেই একটি আদিম পাপ বিদ্যমান থাকে। আমাদের অধিকাংশ বড়লোকই রাষ্ট্রীয় আনুকুল্যে লাইসেন্স পারমিটবাজী ক'রে সৃষ্টি হয়েছে। আপনি কোন মন্ত্রী বা আমলাকে ঘুষ দিয়ে আমদানীর লাইসেন্স নিয়ে তা বাজারে বিক্রি

www.pathagar.com

ক'রে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নিলেন। আপনার এই আয়কে কোনভাবেই কি বৈধ আয় বলা চলে? লাইসেন্স-পারমিটবাজ, চোরাকারবারী, মজুতদার, আমদানীকারক, হুন্ডি ব্যবসায়ী, কমিশন এজেন্ট, দালাল, ফটকাবাজ এদের কারো অর্থকেই আমরা সৎ অর্থ বলতে পারি না, অথচ এরাই আমাদের দেশের বড়লোকদের সিংহ ভাগ। আর আমরা এদেরকে ব্যক্তিগতভাবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তোষণ ও সম্মান ক'রে থাকি। অন্যদিকে যারা উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাদের ক্ষেত্রেও বলা যায় শ্রমিকের ঘাটতি না থাকায় অবাধ শ্রমলুণ্ঠন এবং একচেটিয়া কারবার ক'রে জনগণকে জিম্মি ক'রে অতি উচ্চহারে মালামাল বিক্রি ক'রে সম্পদ গড়ে তোলে।

যাহোক পূর্বের কথায় ফিরে যাই। আমাদের ধনীরা শুধু লুট আর শোষণ করতেই জানে। দেশ গড়ার ব্যাপারে ওদের অবদান আসলে কিছুই নেই। আগের দিনের নিষ্ঠুর সামন্তবাদী শাসন আমলেও দেখা গেছে তৎকালীন জমিদার জোতদাররা সমাজে কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করতো। অনেক শোষণ সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে তারা যে গরীব মানুষকে সাহায্য করতো তার নজীরও আছে। তারা অনেক স্কুল কলেজ তৈরি করেছে। কূপ খনন, ইন্দারা তৈরি, পুকুর খনন, সরাইখানা স্থাপন, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, পানি সেচের ব্যবস্থা, রাস্তা তৈরি ইত্যাদি জনহিতকর কাজ তারা কিছু কিছু করতো। কিন্তু এখনকার ধনীরা শুধু লুটতেই জানে কিছু দিতে জানে না। এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে, আমি সামন্তবাদী শোষণকে সমর্থন করছি। এ ধরনের বিষয় এখনকার দিনে বলতে গেলে দেখাই যায় না। আমাদের দেশে অসংখ্য ধনীর উদ্ভব হয়েছে। সে যুগে গুটি কয়েক জমিদার বা সামন্তরাজ যতটুকু দায়িত্ব পালন করেছে তা আজকের দিনে এরা পালন করলে সমাজের এই চেহারা থাকত না। অবশ্য এর জন্য তাদেরকে একতরফা দোষ দিয়ে লাভ নেই। সামাজিক কাঠামোর কারণে এটাই স্বাভাবিক। আজকের সামাজিক কাঠামোয় আপনি আমি যেই হই না কেন, যদি এ ধরনের পুঁজিপতিতে পরিণত হতে পারি তা'হলে আমাদের আচরণও কমবেশি একই ধরনের হতে বাধ্য।

www.pathagar.com

(৫) আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতি
সন্ত্রাস দুর্নীতি এরা কেউই বন্ধ করতে পারবে না

এবার আমি দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু বলব। সবচেয়ে উদ্বিগ্নকর পরিস্থিতি হচ্ছে দেশের আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোথায় নেমেছে তা সবারই জানা। সরকার ও জনগণ সবাই এ পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন। সরকার সম্প্রতি সন্ত্রাস দমন আইন তৈরি করছে। আমরা সবাই বলেছি বিরোধী পক্ষদের হয়রানী করার মতলবে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ আইন তৈরি করা হয়েছে। খালেদা জিয়া ক্ষমতায় যাওয়ার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন একদিনের জন্য ক্ষমতায় গেলেও ৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করবেন। অথচ বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রত্যাহারতো হলোই না আরো তার সাথে যুক্ত হলো সন্ত্রাস দমন আইন। আসলে কি এ ধরনের সরকারগুলি এ জাতীয় আইন বাতিল করতে পারে বা এ জাতীয় আইন ছাড়া তারা রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে? আমি বলব, না তারা তা পারে না। বি, এন, পি'র বদলে আওয়ামী লীগ বা জাতীয় পার্টি যদি আবার ক্ষমতায় যায় তা'হলে তারা বি, এন, পি'র মত চোখের পর্দা ছাড়া না হলে আইনের নাম বদলাতে পারে, কিন্তু এ ধরনের আইন অবশ্যই তাদের রাখতে হবে। বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ সনে আওয়ামী লীগই উপহার দিয়েছিল। জিয়া সরকারও তা রদ করতে পারেনি, এরশাদ সরকারও তা করেনি। খালেদা জিয়াও তা করতে পারে না। তাদের ক্ষমতায় থাকতে হলে এ ধরনের আইন লাগবেই। যে সমাজ ব্যবস্থা শোষণের উপর নির্ভরশীল, যে সমাজ অপরের শ্রম আত্মসাৎ করার অধিকার দেয়, যে সমাজ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি ক'রে রাখে, যে সমাজ সম্পদের উপর একচেটিয়া অধিকারের স্বীকৃতি দেয় সে সমাজ পরিচালনার স্বার্থে, সে সমাজকে রক্ষা করতে এ ধরনের আইন অপরিহার্য বটে। এ সমাজ কাঠামোয় আমাদেরকেও রাষ্ট্র পরিচালনা করতে দিলে আমরাও এর বাইরে যেতে পারব না, হয়তো রশি একটু ঢিলা হতে পারে। বৃটিশ আমলেও এ ধরনের আইন ছিল যার নাম 'ইন্ডিয়া সেফটি এ্যাক্ট', পাকিস্তান আমলে ছিল 'ডিফেন্স অব্ পাকিস্তান অর্ডিন্যান্স ও রুলস্'। এ ধরনের আইন এখনো ভারত এবং পাকিস্তানে চালু রয়েছে। কারণ ঐ একটিই।

(ক) আসল সন্ত্রাসী কারা

সন্ত্রাসের কথা বলছিলাম। সন্ত্রাস শুধু সমাজের নীচু স্তরে নয় উপরের স্তরে যা রয়েছে তা রীতিমত এক ভয়াবহ ব্যাপার। নীচুস্তরের গুলি চোখে পড়ে, ধরা পড়ে, বিচার হয়। কিন্তু উচুস্তরেরগুলি ধরাছোঁয়ার বাইরে। সন্ত্রাসের সঙ্গে দুর্নীতির

www.pathagar.com

প্রশ্ন আসে। নিঃসন্দেহে সন্ত্রাস তথা হাইজ্যাক, ছিনতাই, মাস্তানী, লুট, চাঁদাবাজী এবং দুর্নীতি অত্যন্ত নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য কাজ। উঁচুস্তরের সমাজপতিরা কিভাবে এর সাথে জড়িত তা দেখা যাক। যদি কেউ আপনার নিকট চাঁদা দাবী করে এবং না দিলে বোমাবাজী করে বা পথে ঘাটে যদি কেউ ছুরি বা পিস্তল ধরে বলে অর্থ দাও নইলে খতম করব বা কেউ যদি ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করে বা আপনাকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে আটক রেখে আপনার আত্মীয় স্বজনকে বলে টাকা দাও নইলে শেষ ক'রে দেব তবে তাকে বলে মাস্তানী ছিনতাই বা হাইজ্যাক গুম ইত্যাদি। কিন্তু যে পুলিশের কর্মকর্তা আধুনিক ও আইনী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ব্যবসায়ীদের নিকট হতে নিয়মিত মাসোয়ারা আদায় করে অথবা একজনকে ধরে থানার গারদে ভরে বলে টাকা দাও নইলে ডাকাতি বা সন্ত্রাসী কেসে দেব তা'হলে সে কি নিজেই হাইজ্যাকার বা সন্ত্রাসী নয়। যে ম্যাজিষ্ট্রেট টাকা না দিলে জেলখানায় পাঠায় সে কি হাইজ্যাকার বা গুমকারী নয়। যে জজ বা আমলা টাকা পেলে একজনের সম্পদ আরেক জনকে দিয়ে দেয় সে কি সন্ত্রাসী বা ছিনতাইকারী নয়। সামান্য চাকুরী করে যারা গুলশান, বারিধারায় বাড়ীর মালিক ও গাড়ির মালিক হয়েছেন তারা কি এ জাতীয় হাইজ্যাক ছাড়া এটা করতে পেরেছেন। সারা জীবনভর এরা হাইজ্যাকার। কিন্তু এদের বিচার কতটুকু হয়? কে করবে এদের বিচার? এদের ধরবেই বা কে? যারা ধরবে বা বিচার করবে তারাও তো ঐ একই গোত্রের। গরীব কৃষক ব্যাঙ্কের সামান্য ঋণ পরিশোধ না করলে তার বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট মামলা হয়। অথচ সমাজের উচ্চ স্তরের লোকেরা অবলীলায় ব্যাঙ্কের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করছে। তারা কি করছে? তারা রীতিমত জাতীয় সম্পদ লুট ক'রে চলছে। অনেকের হিসেবই আমাদের জানা আছে। এরা হচ্ছে সবচেয়ে বড় লুটেরা। এই সব লুটেরাদের বিচার কতটুকু হয়? চোরাচালানে নিযুক্ত সাধারণ মজুররা ধরা পড়ে থাকে, বিচারও হয় তাদের। কিন্তু এদের পিছনে বড় বড় যে সব রাঘব বোয়াল থাকে যারা সরকারেরও চেনা বা সরকারের ভিতরের লোক তারা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকে। মন্ত্রী-মিনিষ্টার ও বড় বড় আমলারা যখন চিনি কেনা থেকে প্লেন কেনা পর্যন্ত সকল ক্রয়-বিক্রয়ে শত শত কোটি টাকা কমিশন নিয়ে থাকে তখন তারা কি লুটেরা হয় না। কোন সরকারের মন্ত্রীরা ও আমলারা এ ধরনের লুটপাট করেনি? এর আগেই বলা হয়েছে এ দেশে যারা ধনী তারা প্রায় সবাই এ ধরনের লুটপাট, চোরাচালানী, কালোবাজারী ও কমিশন খেয়েই বড় হয়েছে। কিন্তু তাদের কার কতটুকু বিচার হয়েছে। বস্তুত পক্ষে সমাজের উচ্চস্তরের এবং ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা সন্ত্রাস, মাস্তানী ও দুর্নীতির সাথে অনেক বেশি জড়িত এবং এরা সমাজের অনেক বেশি ক্ষতি করে। আর

www.pathagar.com

ওদের কারণেই নীচ তলায়ও এসব অপরাধের জন্ম নেয়। অথচ ওরাই আমাদের সমাজের শ্রদ্ধার পাত্র। এ সমাজ ব্যবস্থার নিয়মই হচ্ছে যে, রাষ্ট্র মানুষের সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে। আমাদের শাসনতন্ত্রের ৪২ নং ধারায় প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা বিলিবন্টন করার অধিকার নিশ্চিত করা আছে। সেখানে সম্পদ আপনি কি ভাবে হস্তগত করলেন সেটা বড় কথা নয়। যত অন্যায় ক'রেই আপনি তা ক'রে থাকেন না কেন তা একরকম কেউই দেখতে যাচ্ছে না। কিন্তু যে মুহূর্তে তা আপনি কুক্ষিগত করলেন তা রক্ষার দায়িত্ব হয়ে গেল রাষ্ট্রের। পুলিশ কোর্ট-কাছারীর দায়িত্ব হয়ে গেল তা রক্ষা করার। অসংখ্য বাড়ীর মালিক হওয়ার সুযোগ থাকায় এই ঢাকা শহরে মানুষ জাল-জোচ্চুরী ও টাউটারী-বাটপারী ক'রে, মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমা ক'রে, জোর জবরদস্তি ক'রে একের পর এক বাড়ীর মালিক হয়ে চলছে। অথবা ঘুষ মাস্তানী ও সন্ত্রাসীর টাকায় বাড়ীর মালিক হচ্ছে।

সন্ত্রাস মাস্তানী দুর্নীতি হচ্ছে সামাজিক ব্যাধি, সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে তা সরাসরি যুক্ত। এ ধরনের সামাজিক কাঠামোয় তা কোনভাবেই দূর করা সম্ভব নয়। এ সমাজ ব্যবস্থা নিজেই অহর্নীশি সন্ত্রাস ও দুর্নীতির জন্ম দিচ্ছে। নিম্নস্তরেও একই কারণে বা কিছুটা ভিন্ন কারণ হলেও একইভাবে সন্ত্রাস ও দুর্নীতির উদ্ভব ঘটে। শুধু ঢাকা শহরই নয়, মাস্তান ও সন্ত্রাসীরা গোটা দেশটা নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা ক'রে নিয়েছে। এলাকা ভিত্তিক পৃথক পৃথক মাস্তান বাহিনী রয়েছে। জনগণ পুরোপুরি ওদের হাতে জিম্মি। সরকারের পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেক সময় ওদের চেহারাও পাল্টায়। এক মাস্তান শায়েস্তা হলে আর এক মাস্তানের আবির্ভাব হয়। মানুষের অবাধ সম্পদের মালিক হওয়ার সুযোগ থাকায় সন্ত্রাস, দুর্নীতিও অবাধ গতিতে বিচরণ করে। আসলে সন্ত্রাস, দুর্নীতি জোর করে কমানোর ব্যাপার নয়। যত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থাই হোক না কেন বা যত কঠোর শাস্তিই দেয়া হোক না কেন, এমনকি ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলালেও এসব বন্ধ হবে না। কোন কোন সময় সাময়িকভাবে এসব একটু জোর জবরদস্তিমূলকভাবে কমানো গেলেও কিছুদিন পরেই তা আবার ব্যাপক আকারে শুরু হয়ে যায়। ঐদিন বড় এক বিরোধী দলের এক বড় নেতা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অযোগ্যতার কথা বলে বললেন যে তারা ক্ষমতায় গেলে সন্ত্রাস, মাস্তানী, দুর্নীতি ১৫ দিনেই বন্ধ ক'রে দিবেন।তাদের আমলও দেখা আছে আমাদের। আমি বলি যদি বড় তিন দল হতে তিন জন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও নিয়োগ করা হয় তাহলেও এ অবস্থায় এসব বন্ধ করা সম্ভব নয়। সন্ত্রাস দুর্নীতির মূল কারণ কি, এগুলো কেন হয় তা নির্ণয় ক'রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করতে পারলে এগুলো বন্ধ করা সম্ভব নয়। আর বিশেষ ক'রে যাদের দিয়ে এসব বন্ধ করার চেষ্টা করা

www.pathagar.com

হয়, তারা নিজেরাই যেখানে সন্ত্রাসী বা দুর্নীতিবাজ, সরিষাতেই যেখানে ভূত, বেড়াই যেখানে ক্ষেত খায় সেখানে কি দিয়ে ভূত তাড়াবেন বা ক্ষেত রক্ষা করবেন কি করে। যে দারোগা এদের ধরবে সে নিজেই যেখানে সন্ত্রাসী বা মাস্তান, যিনি বিচার করবেন তিনি নিজেই যেখানে ঘুষ খান সেখানে এসব কিভাবে কমাবেন। একজন ঘুষখোর ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে বিচার হচ্ছিল। একজন আমাকে বলল্ "দেখুন, কি মজাদারী ব্যাপার। এক চোরের বিচার করছে আর এক চোর"।

(খ) কেন মানুষ দুর্নীতি করে

তুমি কি প্রমোশন পেয়ে পেশকার হবে না
জজই থেকে যাবে চিরদিন

দুর্নীতির জন্য ব্যক্তিগতভাবে কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। নিম্নপদস্থ কর্মচারী কর্মকর্তা হতে শুরু ক'রে দারোগা পুলিশ ময় জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের মত সর্বোচ্চ সম্মানী ব্যক্তিরাও কেন এভাবে দুর্নীতিতে অবগাহন করে তা একটু চিন্তা করার আছে। এর কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে সম্পদ কুক্ষিগত করা। যেখানেই সুযোগ থাকবে সেখানেই মানুষ এটা করতে চেষ্টা করবে—তার যত সম্পদই থাকুক না কেন। নীতিকথা বেশিদিন কাজ করে না। আমাদের সমাজে অসীম সম্পদের মালিক হওয়ার সুযোগ থাকায় সবাই সে সুযোগের ব্যবহার করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়তঃ এসমাজ যেহেতু মানুষের জীবনের বা তার ভবিষ্যতের দায়-দায়িত্ব নেয় না, অসুখ-বিসুখ, মৃত্যু দুর্ঘটনা কোন কিছুতেই সমাজ ফিরে তাকায় না, সেহেতু ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্যও মানুষ দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। তৃতীয়তঃ ছেলে-মেয়ে নিয়ে খেয়ে-পরে বাঁচতে বা স্ট্যাটাস নিয়ে চলতেও অনেককে দুর্নীতিতে ডুবতে হয়। চতুর্থতঃ আর একটি বিষয় আছে পারিপার্শ্বিক অবস্থা। যার ফলেও মানুষ বেশিক্ষণ ভাল থাকতে পারে না। ভাল থাকা বিষয়টি আপেক্ষিক ব্যাপার। এক একটি সমাজে ভাল থাকা কথাটির রূপও বদলায়। যেমন এই সমাজে আপনি কয়েকশত কোটি টাকার মালিক হলেও ভাল আছেন খারাপ হননি। আবার এমন সমাজ আছে যেখানে এত বেশি টাকার মালিক হতে চেষ্টা করলে আপনি খারাপ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারেন। যাহোক পারিপার্শ্বিকতার কথা বলছিলাম। একটি গল্প বলি। কোন এক মফস্বল শহরের এক পেশকার ঈদের দিন তার জজ সাহেবকে তার বাড়ীতে দাওয়াত দিয়েছে। ঈদের দিনে যেহেতু সবাই সমান কাজেই পেশকারের বাড়ীতে জজ সাহেবের

www.pathagar.com

যেতে অসুবিধা নেই। জজ সাহেব তার বেগম সাহেবাকে নিয়ে পেশকারের বাড়ীতে গিয়েছেন। পেশকারের বাড়ীর আসবাবপত্র শান শওকত দেখে জজ সাহেবের স্ত্রী বুঝলেন পেশকার তার সাহেবের চেয়ে অনেক বড় সাহেব। তিনি তখন জজ সাহেবকে বললেন তুমি কি চিরকালই জজ সাহেব থাকবে, তোমার কি কোন দিন প্রমোশন হবে না, তুমি কি জীবনে প্রমোশন পেয়ে পেশকার হতে পারবে না। জজ সাহেব তার স্ত্রীর দুঃখ বুঝে বললেন, আগামীকাল হতে চেষ্টা করব। যা বলছিলাম—এমন কোন সিষ্টেম কি আছে যার কারণে সন্ত্রাস, দুর্নীতি আপনা-আপনি দূর হতে পারে।

(গ) কোরিয়ায় কেন সন্ত্রাস দুর্নীতি নেই

সারা কোরিয়ায় মাত্র ১২৮ জন উকিল

কোরিয়া যাওয়ার পর আমি তাদেরকে জানালাম যেহেতু আমি পেশাগতভাবে একজন আইনজীবী সে কারণে আমি সে দেশের আইনজীবী বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। আমার তিন সপ্তাহব্যাপী ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে সে দেশের আইনজীবীদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমার বৈঠক হয়। একটি দেশের সমাজ ব্যবস্থা বুঝতে হলে তার আইন ব্যবস্থা সবচেয়ে বড় সহায়ক। প্রায় তিন সপ্তাহ পুরো দেশ ঘুরে বহু শিল্প কারখানা, কৃষি খামার পরিদর্শন ক'রে যতটুকু বুঝতে পেরেছিলাম তাতে সবটুকু সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু আইনজীবীদের সঙ্গে এই বৈঠকের পর সব কিছু অনেক পরিষ্কার হয়ে গেল। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজনীতির একটি পরিষ্কার চিত্র আমি পেয়ে গেলাম। দুই কোটির বেশি লোক সংখ্যার দেশে মাত্র ১২৮ জন উকিল (আমাদের প্রায় ৫০ হাজার)। শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। বুঝলাম একটি দেশে অপরাধের সংখ্যা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা যত বেশি সেই সমাজে ততো বেশি উকিলের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ উকিল বেশি মানেই অপরাধ বিশৃঙ্খলা অশান্তি বেশি। সে দেশের রাজধানীতে একটি সুপ্রীম কোর্ট, ১২টি প্রদেশে ১২টি কোর্ট, তার নীচে কাউন্টি অর্থাৎ আমাদের জেলার মতো। সব কাউন্টিতে কোর্ট নেই। অনেক জায়গায় কয়েকটি কাউন্টির জন্য একটি কোর্ট রয়েছে। কি ধরনের অপরাধ সে দেশে হয় জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, বেশিরভাগ অপরাধ গাড়ী দুর্ঘটনা ও কো-অপারেটিভের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত এবং বিদেশী অনুচরদের অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত। Dacoity অর্থাৎ ডাকাতি একটি ইংরেজী শব্দ, তাদের দেশে তা আছে কিনা জানতে চাওয়ায় স্বয়ং আইনজীবীদের সভাপতি আমি কি ধরনের অপরাধ বোঝাতে চাচ্ছি তা জিজ্ঞাসা করলেন। Dacoity কথাটাই বুঝতে পারেননি। তখন আমি চুরি ও ডাকাতির

www.pathagar.com

মধ্যকার পার্থক্য ব্যাখ্যা ক'রে বোঝানোর পর জানালেন যে এ ধরনের অপরাধ তাদের দেশে অকল্পনীয়, তাদের দেশে এসব চিন্তাই করা যায় না। হাইজ্যাকের কথা জিজ্ঞাসা করলে জানতে চান আমি প্লেন হাইজ্যাকের কথা বলছি কিনা? নারীঘটিত অপরাধ সম্পর্কে জানালেন যে দুই এক বছরে দুই একটি হয়ে থাকে। যদিও সে দেশে নারীদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। আমাদের মতো তাদেরকে মেয়েমানুষ বানিয়ে রাখা হয়নি। সর্বত্র তারা পুরুষের পাশাপাশি কাজ করছে। ওদেশে কেউ অপরাধ করলে আইনজীবীদের মধ্যে যাকে বা যে কয়জনকে সে নির্বাচিত করবে তাকে না তাদেরকে তার পক্ষে কাজ করতে হয়। আইনজীবীরা রাষ্ট্র হতে বেতন পায়। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কত বেতন পাই। আমি যে বেতন ছাড়া উকিল তা কিভাবে বুঝাই। ঐ দেশে সন্ত্রাস বা দুর্নীতির মাধ্যমে অঢেল সম্পদ করার কোন সুযোগ না থাকায় আমাদের মতো অপরাধ করার সুযোগ বা প্রবণতা সেখানে নেই। জমি সেখানে কো-অপারেটিভের অধীনে চাষ হয়। আপনি ইচ্ছা করলেই শত শত একর জমি কিনে বা অন্যের জমি বাড়ী ঘর দখল ক'রে বড়লোক হতে পারেন না। আমাদের মতো রেজিষ্ট্রি অফিসের বালাই নেই ওখানে। কো-অপারেটিভের মাধ্যমে যে যে পরিমাণ শ্রম দেয় তার জন্য সেই অনুপাতে ওয়ার্ক পয়েন্ট জমা হয় এবং তার ভিত্তিতে ফসল বা ফসলের অর্থ বন্টন হয়। প্রত্যেকের বাড়ী আছে। কিন্তু ইচ্ছা করলেই কেউ বাড়ীর পর বাড়ী কিনে বা আইনের ফাঁক-ফোকরে বাড়ীঘর দখল ক'রে বাড়ীর মালিক হয়ে তা ভাড়া দিয়ে সামন্তবাদী কায়দায় শোষণ চালাতে পারে না। আমাদের মতো একজন সেখানে অনেক বাড়ীর মালিক হতে পারে না। এই ঢাকা শহরেই এমন অনেক লোক আছে যারা ১০০ এর উপরে বাড়ীর মালিক। তারপরেও তাদের বাড়ী করার নেশা কমেনি। ঢাকা শহরের বেশির ভাগ অপরাধ ও মামলা-মোকদ্দমা এই সব বাড়ী-ঘর, জমি-জায়গা নিয়ে। সে দেশে আপনার বাড়ী আছে, আপনার বাড়ী উত্তরাধিকার সূত্রে আপনার ছেলেমেয়েরা পাবে। কিন্তু যদি দেখা যায় ঐ বাড়ীতে আপনার সব ছেলেমেয়ের জায়গা হচ্ছে না তা'হলে যার জায়গা হচ্ছে না তাকে সরকার বাড়ী করে দেবে। ঐ বাড়ীর মালিক সে হবে এবং তার ছেলেমেয়েরা তার পরে ঐ বাড়ীর মালিক হবে। শহর অঞ্চলে কর্মজীবীদের রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাসা দেয়া হয়েছে। কোরিয়ায় সন্ত্রাস, ঘুষ, দুর্নীতি, মাস্তানী না থাকার মূল কারণ এই নয় যে সেখানকার মানুষ সবাই ফেরেস্তা হয়ে গিয়েছে। আসলে সমাজ কাঠামোর কারণেই মানুষ এসব থেকে দূরে রয়েছে, ইচ্ছা করলেও এসব অপরাধ করার সুযোগ নেই এবং এভাবে চলতে থাকায় তাদের নৈতিকতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সারা কোরিয়ায় কোন পতিতালয় বা দেহপসারিনী খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটার

www.pathagar.com

পেছনেও ঐ একই কারণ। ওদের অর্থনৈতিক জীবনে নিশ্চয়তার কারণে নৈতিকতা অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে। কোরিয়ার মতো ঠিক একই সমাজ কাঠামো আমরা গড়ে তুলব তা বলছি না এবং ইচ্ছা করলেও তা সম্ভব নয়। তবে আমাদের বর্তমান কাঠামো পরিবর্তন অবশ্যই আবশ্যক। নইলে একদিকে যেমন সন্ত্রাস, ঘুষ, দুর্নীতি, ছিনতাই, রাহাজানী থেকে কোনভাবেই জাতিকে মুক্ত করতে পারব না, এসব বন্ধের জন্য যত আইনই আমরা করি না কেন — যত চেষ্টাই করি না কেন তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলবে। অন্যদিকে দেশের এই দারিদ্র পীড়িত মানুষদেরও রক্ষা করারও কোন উপায় থাকবে না। অবাধ সম্পদের মালিক হওয়ার রাস্তা খোলা রাখবেন, দুর্নীতি লুটপাটের সবরকম সুযোগ রাখবেন, নিজেরা লুটপাট ক'রে বড়লোক হবেন, আর আমাকে ভাল থাকতে বলবেন—নীতিকথা শোনাবেন তা'হতে পারে না। আসুন এ সুযোগগুলোর পথ বন্ধ ক'রে আমরা সবাই ভাল হয়ে যাই।

এসব না ক'রে গোটা ব্যবস্থা বহাল রেখে কিছুতেই জনকল্যাণমুখি রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সে যেই চালাক না কেন। আপনি যেই হোন না কেন, যত ভাল মানুষই হোন না কেন, কিভাবে রাষ্ট্র চালাবেন? আপনার মন্ত্রীরা ডাকাত, আমলারা চোর, পুলিশরা মাস্তান, ব্যবসায়ীরা লুটেরা, বিচার বিভাগ অচল; আপনার চারদিক ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ, চোরাকারবারী, হাইজ্যাকার, ছিনতাইকারী ও টাউট বাটপার; আপনার গদি ঠিক রাখতে হ'লে দল ঠিক রাখতে হয় কাজেই দলের লোকদেরও বাধ্য হয়ে লুটপাটের সুযোগ ক'রে দিতে হয়; এমনকি আপনার পরিবারের লোকরাও আপনাকে ডুবাতে ব্যস্ত— আর এদেরকে নিয়ে চালাতে হবে রাষ্ট্র। ফলে যা হবার তাই হয়। কেউ রক্ষা পায়নি। সবাই ডুবে গেছে এবং দেশটিকেও ডুবিয়েছে।

(ঘ) সৎ মানুষ না সৎ সমাজের কাঠামো

অনেকেই সৎ মানুষ তৈরীর কথা ব'লে থাকেন। সমাজের মানুষ সৎ ও ধার্মিক হয়ে গেলেই সমাজ ঠিক হয়ে যাবে ব'লে তারা দাবী করেন। আমি অসৎ মানুষ তৈরি করার কথা বলছিনা। তথাপি সত্যি কথার স্বার্থে যে কথা বলতে হয় তা হচ্ছে, সমাজের সব মানুষকে কি সৎ ও ধার্মিক করা সম্ভব, এমন কোন সমাজ কি ছিল যেখানে সব মানুষ সৎ ও ধার্মিক ছিল? এর এক কথায় উত্তর না। আরও যা বলতে হয় তা হচ্ছে, মানুষ সৎ ও ধার্মিক হয়ে গেলেই কি সমাজ ঠিক হয়ে যায়। আমি বলব না। এ সমাজ নিজেই আপনাকে সৎ ও ধার্মিক হতে দিবে না। আপনি বড়জোর ধার্মিক হতে পারেন কিন্তু সৎ হতে পারেন না। আর অসৎ লোক ধার্মিকই বা কিভাবে হয়। ইচ্ছে করলেও আপনি সৎ জীবন

www.pathagar.com

যাপন করতে পারবেন না। আমার এক বন্ধু এ দেশের প্রতিষ্ঠিত ধনী এবং অত্যন্ত ধার্মিক লোক। কাঁকরাইল মসজিদ তার সবচেয়ে শান্তির জায়গা। আমাকে প্রায়ই ধর্মের কথা শোনান, ধর্মের অনুশাসন মেনে চলার উপদেশ দেন। ঐদিন তিনি দুঃখ ক'রে বললেন যে তাকে সেদিন বাধ্য হয়ে এক অফিসে ঘুষ দিতে হলো। আমি তাকে বল্লাম, "আপনার মত ধার্মিক পরহেজগার ও ধনী ব্যক্তি যদি অর্থ-সম্পদের জন্য ঘুষ দেয় তা'হলে রাস্তার একজন অর্থের জন্য ছিনতাই করলে তার দোষ কোথায়? তার সঙ্গে আপনার পার্থক্য কতটুকু?" প্রথমে তিনি লা-জওয়াব হয়ে গেলেন। পরে বল্লেন, এভাবে সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চল্‌লে তাকে রাস্তার ফকির হতে হবে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এত ধার্মিক লোক হওয়া সত্ত্বেও কি সৎ জীবন যাপন করতে পারছেন বা অন্যেরা কি পারছে? তিনি বল্লেন, এ সমাজে বাঁচতে হলে তা সম্ভব নয়। আমি তাকে বল্লাম, "তা'হলে আপনি আমি সৎ ও ধার্মিক হলেও কোন লাভ হচ্ছে না। সৎ বা ধার্মিক থাকতে পারছি না। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোকে কেন্দ্র ক'রেই আমাদের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। সমাজ কাঠামো নিজেই যেখানে আমাদেরকে অসৎ ও অধার্মিক বানাচ্ছে সেখানে আমরা ভাল হতে চাইলেও কোন কাজে আসছে না। আপনি যত ধার্মিকই হোননা কেন, যত সৎই থাকতে চান না কেন এ সমাজে তা হওয়ার উপায় নেই। আপনার মত ধার্মিক লোককেও যেখানে সমাজ কাঠামো অসৎ হতে বাধ্য করে সেখানে সাধারণ লোক আর কি করবে? তা'হলে মূল বিষয় আপনার সততা ও ধার্মিকতা নয়, মূল বিষয় সমাজ কাঠামো"। শোষণের উপর নির্ভরশীল এই কাঠামো কাউকেই ভাল থাকতে দিতে পারে না। অঢেল সম্পদের মালিক হওয়ার সুযোগই গোটা সমাজকে পঙ্কিলতায় ডুবাচ্ছে। মানুষ সৎ হতে চাইলে কাঠামো সৎ হতে না দিলে মানুষ সৎ হতে পারে না। কাঠামো অন্যরকম হলে অর্থাৎ আপনার খারাপ হওয়ার সুযোগ না থাকলে আপনি ইচ্ছে করলেও খারাপ হতে পারবেন না। কোরিয়ায় ইচ্ছে করলেও কারো আমাদের মত খারাপ হওয়ার উপায় নেই। এক কথায় বলা যায় মানুষ সৎ ও ধার্মিক হলেও সমাজ ঠিক হয় না কিন্তু সমাজ কাঠামো ঠিক হলে মানুষকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সৎ ও ভাল হতেই হয়। তবে একটি কথা, সৎ সমাজের কাঠামো গড়ে তুলতে কিছু সৎ ও ভাল মানুষের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে।

www.pathagar.com

(৬) অদ্ভুত আইন ও বিচার ব্যবস্থা

এ রাষ্ট্রের বিচার করার অধিকার নেই

আমাদের আইন ও বিচার ব্যবস্থা বড়ই অদ্ভুত। একজন সক্রিয় আইনজীবী হিসেবে এ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা বড়ই বিচিত্র । রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে ও বিচার করে। আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বলার পূর্বে যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে—এ রাষ্ট্রের বিচার করার অধিকার কতটুকু আছে। আমি আগেই বলেছি এ সমাজে রাঘব বোয়ালদের বিচার হয় না। তারা যেন আইন ও বিচারের উর্ধ্বে। বিচার হয় সাধারণ জনগণের, অবহেলিত মানুষের। আমাদের সমাজে যে ধরনের অপরাধ সংগঠিত হয় তার ৮০-৯০ ভাগই সমাজ কাঠামোর কারণে হয়ে থাকে। আজ যারা জেলখানায় তার প্রায় সবাই সমাজ কাঠামোর সরাসরি শিকার। সমাজের কাঠামো অন্যরকম থাকলে এ ধরনের অপরাধ করার ওদের কোন সুযোগও হতো না জেলেও থাকতে হত না। যা হোক, রাষ্ট্রের বিচার করার ক্ষমতা সম্পর্কে বলছিলাম। এ সম্পর্কে আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা মানুষের জীবনের দায়-দায়িত্ব নেয় না, যে রাষ্ট্র মানুষের মৌলিক অধিকার সমূহ পূরণ করে না, যে রাষ্ট্র কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে না সে রাষ্ট্রের বিচার করার কোনই অধিকার থাকতে পারে না। এ সমাজে যদি কেউ পরিবার পরিজন নিয়ে সাতদিন না খেয়েও থাকে, কিংবা কেউ যদি না খেয়ে মারাও যায় তা'হলেও রাষ্ট্রের কোন দায়-দায়িত্ব থাকেনা। অথচ যদি দেখা যায় ঐ লোক স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ক্ষুধার জ্বালা মিটাতে চুরি করতে বাধ্য হয় তা'হলে সমাজ ও রাষ্ট্র খড়্গহস্ত হয়ে উঠে। তার বিচার করে, তাকে জেলে দেয়। প্রচন্ড শীতে বিনা শীত বস্ত্রে সে যদি কোন 'টু-লেট' ওয়ালা বাড়ীতে ঢুকে পড়ে তা'হলে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসাবে তার জেল হয়। যে রাষ্ট্র তার নাগরিকের বাসস্থানের সংস্থান করতে পারে না, চিকিৎসা দিতে পারেনা, বস্ত্রহীন মানুষকে বস্ত্রের নিশ্চয়তা দিতে পারে না, সে রাষ্ট্রের বিচার করার ক্ষমতা আছে কি? যে রাষ্ট্র তার নাগরিকের মাথা গোঁজার ঠাঁই দিতে পারে না, চিকিৎসা দিতে পারে না, শিক্ষা দিতে পারে না, উলঙ্গ থাকলে কাপড় দিতে পারে না, সে রাষ্ট্রের বিচার করার ক্ষমতা কোথায়? একজন পিতা যদি তার সন্তানকে খাবার দিতে না পারে, কাপড় দিতে না পারে, শোবার জায়গা দিতে না পারে তা'হলে সে সন্তান যদি রাস্তা ঘাটে থাকে ও অপকর্ম ক'রে বেড়ায় তা'হলে যেমন তাকে শাসন করার অধিকার তার পিতার থাকে না, তেমনিভাবে যে রাষ্ট্র তার জনগণের কর্মসংস্থান, বাসস্থান, চিকিৎসার দায় দায়িত্ব নিতে পারে না, সে রাষ্ট্রের পক্ষেও তার জনগণের বিচার করার কোন অধিকার থাকতে পারে না। বিচার করার আগে অবশ্যই রাষ্ট্রকে তার নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। কোন দায়িত্ব পালন করবেন না অথচ বিচার করবেন। কোথায় পেলেন এই অধিকার? দায়িত্ব পালন করা ছাড়া শাসন করার অধিকার অর্জিত হতে পারে

www.pathagar.com

না। তাই বলি দায়িত্বহীন রাষ্ট্র তার জনগণের উপর কোন অধিকার খাটাতে পারেনা।

(ক) আইন ব্যবস্থা

আইনের শাসন চাই না

আইন ব্যবস্থার কথা বলছিলাম। আমাদের আইন হচ্ছে অন্ধ আইন। এ অন্ধ আইন জনগণের কোন কাজে আসে না বা আসতে পারে না। অনেকেই শ্লোগান দিয়ে থাকেন "আইনের শাসন চাই, আইন তার নিজ গতিতে চলুক এটা চাই"। এটা একটা কথার কথা ভেগ-কথা, একটা ফাঁকা বুলি, অর্থহীন প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। কোন্ আইনের শাসন চাই, কার আইন চাই, কিসের আইন চাই, সেটাই বড় কথা। আইন কাদের জন্য, কাদের স্বার্থে আইন, সেটাই আসল কথা। আইন নিজেই যেখানে জনগণের স্বার্থ বিরোধী সেখানে আইনের শাসন চাওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে। বৃটিশ আমলে আইন ছিল বৃটিশের স্বার্থে, পাকিস্তান আমলে আইন ছিল পাকিস্তানী বুর্জোয়াদের স্বার্থে। "মার্শাল ল" দিয়ে সামরিক জান্তা ও শোষক শ্রেণীর স্বার্থে সামরিক শাসনের আইন দেয়া হয়। এসবই কিন্তু আইন। বিশেষ ক্ষমতা আইন, সন্ত্রাস দমন আইন এ সবও আইন। আইনের শাসন চাবেন অথচ আইন মানবেন না তা হতে পারে না। আইনের শাসন চাইলে কোন কিছুরই বিরোধিতা করা সম্ভব নয়। সব আইনকেই সুবোধ বালকের ন্যায় মেনে নিতে হবে। অথচ আমাদের পুরো আইন ও বিচার ব্যবস্থা হচ্ছে শাসন, শোষণ, নিষ্পেষণকে রক্ষা করার জন্য। শোষক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য রাষ্ট্র দায়িত্ব নিয়েছে এবং তা করতে গিয়ে এক জটিল আইন ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। হাজার হাজার আইনের বই আমাদের পড়তে হয়। নিত্যনতুন আইন সৃষ্টি হয়। মনে রাখবেন, এসব আইন ও আইনের বই বর্তমান সমাজ কাঠামোর স্বার্থে এবং সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে তথা সম্পদের মালিকানার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সামাজিক কাঠামো বদলে গেলে এসব বই কাগজের ঠোঙা তৈরি করা ছাড়া আর কোন কাজে লাগবে না। তথাপি এতো বই ও আইন দিয়েও এ কাঠামো ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। জোড়া তালি দিতে গিয়ে অনবরত নিত্যনতুন আইন করতে হচ্ছে, আইনের নতুন নতুন ব্যাখ্যা হচ্ছে, নতুন নতুন বই বের হচ্ছে। যেহেতু এ কাঠামো নিজেই টিকতে পারছে না সেহেতু যত বেশি আইন তৈরি করা হচ্ছে অপরাধও তত বাড়ছে এবং অপরাধীর অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়ার ফাঁক-ফোকরও তত বেশি বের হচ্ছে। এত আইন তৈরি করা হলেও এসব আইন জনগণের খাওয়া-পরার অধিকার নিশ্চিত করে না। কিংবা জনগণের বেঁচে থাকার অধিকারও দেয় না। সুতরাং আমরা বলতে পারি না যে আইনের শাসন চাই বরং আমরা বলি, জনগণের স্বার্থে আইন চাই, বেঁচে থাকার অধিকারের জন্য আইন চাই, শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির আইন চাই। যে আইন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করবে না, যে আইন শোষণ নির্যাতনকে স্বীকৃতি দিবে না, যে আইনের ফাঁক-ফোকরে

www.pathagar.com

রুই কাতলা পার হবে না, যে আইন অন্ধ হবে না, যে আইন মানুষের অধিকারকে নিশ্চিত করবে সেই আইন আমরা চাই এবং সেই আইনের শাসন চাই।

(খ) বিচার ব্যবস্থা

এক ছেলে ভুলানো প্রতারণামূলক দাঁড়িপাল্লার নাটক

আমাদের পুরো বিচার ব্যবস্থাই হচ্ছে ধনীদের স্বার্থের পরিপূরক এবং প্রহসনমূলক নাটক ছাড়া কিছুই না। কোর্ট-কাছারীর ঘুষ-দুর্নীতির কথা বাদই দিলাম। যদিও দেখি এখানে অনেক ক্ষেত্রেই মামলার রায় কেনা-বেচা হয়ে থাকে, নিলামের মতো ডাক হয়ে থাকে। অবশ্য অপ্রকাশ্যে। ঢাকা বারে একটি কথা চালু হয়েছে। অমুক অমুক জজ আযান দিয়ে ঘুষ খায়। আগে মাইক্রোসকোপ দিয়ে খুঁজতে হতো কে খায়, আর এখন খুঁজতে হয় কে খায় না। সামাজিক বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধির সাথে সাথে পুরানো নীতিবোধও দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এবং সর্বক্ষেত্রেই এটা মহামারীর আকার নিচ্ছে। কিছু কিছু বিচারকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে তা'ও দেখা যাচ্ছে। তবুও ধরে নেই এসব দুর্নীতি বলে কিছু নেই— সবাই সৎ এবং ন্যায্য বিচার করে। তারপরেও বর্তমান ব্যবস্থায় কেমন বিচার হচ্ছে দেখা যাক।

মামলার সাক্ষীর উপর জেল-ফাঁস হয় বা সম্পত্তি হাত-বেহাত হয়। প্রথম প্রহসন হচ্ছে সাক্ষীকে হলফ ক'রে বলতে হয় "যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য বই মিথ্যা বলিব না-কোন কিছু গোপন করিব না"। এই হলফ নিয়ে কেউ সম্পূর্ণ সত্য কথা বলেছে তা আমার জানা নেই বা আমি দেখিনি। এবং সম্পূর্ণ সত্য সাক্ষ্য দিলে কেউ মামলায় জিততেও পারে না। সম্পূর্ণ সত্য প্রতিষ্ঠা করতেও কিছু কিছু মিথ্যার আশ্রয় নিতেই হবে। অবস্থা এ রকম দাঁড়িয়েছে যে কোর্টে সাক্ষ্য দিতে গেলে মিথ্যা কথা বলা জায়েজ। অথচ শালিস বিচারে দেখেছি সেখানে সহসা কেউ মিথ্যা কথা বলতে পারে না, বলেও না— বললেও ধরা পড়ে যায়। এই মিথ্যা সাক্ষ্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে প্রায় সম্পূর্ণ বিচার ব্যবস্থা। জমিজমার হাত অদল-বদল, জেল-ফাঁসি সবই এর উপর নির্ভরশীল।

বিচারকদের পিছনে বিচারের প্রতীক হিসাবে দাঁড়িপাল্লা থাকে। অর্থাৎ নিক্তির মাপে চুলচেরা বিচার হবে, সঠিক ভাবে সমান মাপ হবে। দাঁড়িপাল্লাই যদি বিচারের প্রতীক হয় তা'হলে কি দাঁড়ায়। ধরুন আমরা দুইজন মক্কেল আমাদের যার যার দাবীর স্বপক্ষে দুইজনে দুই পাল্লায় আমাদের দলিল ও কাগজপত্র দিলাম। তা'হলে যার কাগজপত্র বেশি সঠিক দাঁড়িপাল্লা তার দিকেই ঝুঁকবে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় আমাদের মধ্যে যে বেশি ধূর্ত, মামলা মোকদ্দমা বেশি বুঝে, জাল-জোচ্চুরী বেশি করতে পারে, কাগজপত্র বেশি বানাতে পারে, বেশি তদবীর করতে পারে, ভাল সাক্ষী জোগাড় করতে পারে এবং টাকা পয়সা যার বেশি আছে দাঁড়িপাল্লা তার দিকেই ঝুঁকছে। এ ক্ষেত্রে আপনার এ ধরনের যোগ্যতাই দাঁড়িপাল্লা ঝোঁকার মূল কারণ। ভাল কাগজপত্র নিয়েও মামলা মোকদ্দমার ফাঁক-ফোকর না বুঝার কারণে বা টাকা পয়সার অভাবে বা

www.pathagar.com

সাক্ষীপত্র না আনতে পারার কারণে অন্যজন মামলায় হেরে গেল। অর্থাৎ আপনার এসব যোগ্যতাই মামলার মেরিট।

আবার ভিন্ন ভিন্ন উকিল নিয়োগ করার কারণেও মোকদ্দমার ফল ভিন্ন ভিন্ন হচ্ছে।। দাঁড়িপাল্লা এক দিকে না ঝুঁকে অন্য দিকে ঝুঁকছে। অনেক সময় দেখা যায় ভাল কাগজপত্র নিয়েও উকিলের ভুলে বা দুর্বল উকিলের কারণে মামলার ফলাফল ভিন্ন হচ্ছে। এসবের কারণে মানুষ সব সময়ই বড় উকিল রাখার চেষ্টা করে। আমার জীবনেও বহু মামলায় জিতেছি অনেক দুর্বল কাগজপত্র নিয়ে আইনের মারপ্যাঁচে ও ধূর্ত বুদ্ধি খাটিয়ে। আবার বিপক্ষের উকিলের ভুল পদক্ষেপে বা আইনের উপর তার আমার চেয়ে বেশি দখল না থাকার কারণে বা আইনকে তার স্বার্থে ঠিকমতো ব্যবহার না করতে পারার কারণে বা আমার প্যাঁচ সে বুঝতে না পারার কারণেও বহু মামলায় জিতেছি। আবার উল্টো ফলও ফলেছে। অপর পক্ষের আইনজীবীর ধূর্ত বুদ্ধির কাছে মার খেয়েছি। অর্থাৎ মামলার মেরিট নির্ভর করে উকিলের মেরিটের উপর।

আবার একই মামলা ভিন্ন ভিন্ন জজের নিকট ভিন্ন ভিন্ন রায় হচ্ছে। একই ধরনের মামলা যদি আপনি ভিন্ন ভিন্ন জজের নিকট দায়ের করেন তা'হলে দেখা যাবে মামলার প্রতি পদক্ষেপে বা পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন আদেশ ও রায় হচ্ছে। এক ম্যাজিষ্ট্রেট বেল দিচ্ছেন না, অপর জন দিচ্ছেন। এক জজ ইনজাংশন দিচ্ছেন না, অপর জন দিচ্ছেন। মামলা দাখিল করার আগে আমাদের চিন্তা করতে হয় কোন জজের কাছে মনমতো আদেশ বা রায় পাওয়া যাবে এবং তার কোর্টে মামলা নেয়া যায় কিনা। মক্কেল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সবল হলে জনতে চায় জজ সাহেব টাকা পয়সা খান কিনা।

অনেক সময় আফসোস করি এই জজ না হয়ে ঐ জজ হলে এরকম রায় পেতাম না। এটা হাইকোর্ট সহ সব কোর্টের জজের বেলায় প্রযোজ্য। হাইকোর্টে এক জজের কাছে এক মামলায় রুল পেলাম না আবার একই মামলায় বা একই ধরনের মামলায় অন্য জজের নিকট রুল পেলাম। এক জজের নিকট রুল না পেয়ে মামলা উঠিয়ে নিয়ে অন্য জজের নিকট দাখিল ক'রে রুল নেয়া হয় বলে গোস্বা প্রকাশ করা হয়েছে। গোলাম আযমের কেসে আমরা দেখলাম ভিন্ন ভিন্ন জজের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রায়। সে হয় নাগরিক হবে না হয় হবে না। এ ধরনের ভূরিভূরি উদাহরণ রয়েছে আমাদের কেস রিপোর্টের বইগুলিতে।

আবার নীচের কোর্টে এক রায় হচ্ছে আপীলে গিয়ে অন্য রকম হচ্ছে, হাইকোর্টে এক রকম, সুপ্রীম কোর্টে আর এক রকম। ঐ মক্কেলের উপরের কোর্টে যাওয়ার সামর্থ না থাকলে যে ভুল বিচার বা রায় পেল সেটাই সঠিক বিচার হিসাবে রয়ে গেল।

আবার একই জজ এ বেলায় এক রকম আদেশ দিচ্ছেন, ঐ বেলায় আরেক রকম, আজ এক রকম, কাল আরেক রকম দিচ্ছেন। জজ সাহেবদের মেজাজ মর্জি বুঝে আমাদের চলতে হয়। বাড়ীতে বিবি সাহেবার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছেন কিনা তা'ও বুঝতে চেষ্টা করতে হয়। ভুল বিচারে কত লোক যে

www.pathagar.com

সর্বশান্ত হয়েছে বা সাজা খাটছে তা কল্পনাও করতে পারবেন না। এমনকি ফাঁসী পর্যন্ত হয়ে যায় ভুল বিচারে।

আবার দেখা যায় আজকে হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্ট এক বিষয়ের উপর যে রায় দিচ্ছেন পরবর্তীকালে নিজের রায় নিজেই উল্টাচ্ছেন, কিন্তু এতে যার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে তা আর ফিরল না।

আবার নিত্য নতুন আইন বদলানোর ফলে একই বিষয়ের উপর ভিন্ন ভিন্ন রায় হচ্ছে। কালকে একজন সাজা পেল বা মুক্তি পেল অথবা সম্পত্তি পেল আবার আজ আইন বদল হওয়ায় উল্টো ফল হল অন্যের বেলায়।

দাঁড়িপাল্লাই যদি বিচারের প্রতীক হবে তা'হলে তাতে আমার জিনিসই উঠানো হোক আর আপনার জিনিসই উঠানো হোক মাপ সবসময় ঠিকই থাকবে। আমার উকিলই উঠাক আর আপনার উকিলই উঠাক মাপ ঠিকই থাকবে। পাল্লা ধরে যে জজ আছেন তিনি যেই হোন না কেন, মাপ সবসময় একই হওয়া উচিত। একজন দাঁড়িপাল্লা ধরলে একদিকে ঝুঁকবে অথচ আর একজনে ধরলে আরেক দিকে ঝুঁকবে এটা হতেই পারে না। দাঁড়িপাল্লার এক পাল্লায় একসেরে পাথর অপর পাল্লায় আধাসেরে পাথর দিলে সে পাথর যারই হোক না কেন, যার মাধ্যমেই সে পাথর ঐ পাল্লায় দেয়া হোক না কেন, যেই ঐ পাল্লা ধরুক না কেন, আধাসের কোনদিনই নীচে ঝুঁকবে না। কিন্তু বিচারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন অবস্থা দেখা যাচ্ছে। মক্কেল, উকিল বা জজের কারণে আধাসের একসের হচ্ছে একসের আধাসের হচ্ছে। আসলে আমাদের সমস্ত বিচার ব্যবস্থাই এক ছেলেভুলানো প্রতারণামূলক ব্যবস্থা, এ এক নাটক। অবশ্যই বন্ধ করতে হবে এ নাটক।

আগেই বলেছি এ বিচার ব্যবস্থা এ সমাজ কাঠামোর স্বার্থেই সৃষ্ট এবং সমাজ কাঠামোর স্বার্থেই তা টিকে রয়েছে। ব্যক্তি বিশেষকে দোষ দিয়ে লাভ নেই এ ব্যাপারে। শোষণমূলক এ সমাজ ব্যবস্থার ফসলই হচ্ছে এ বিচার ব্যবস্থা। যত অন্যায় ভাবেই আপনি সম্পদ গড়ুন না কেন তা রক্ষা করার নিশ্চয়তা দিচ্ছে এ রাষ্ট্র ও তার বিচার ব্যবস্থা। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো বদলানোর সাথে সাথে বিচার ব্যবস্থাও নিজ গতিতেই বদলাতে বাধ্য। এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মানুষগুলোও বদলাতে বাধ্য। কোরিয়ার সমাজ ব্যবস্থায় তাদের বিচার ব্যবস্থার রূপ ভিন্ন দেখেছি। আমি জানি, আমাদের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ করে একজন আইনজীবী হিসাবে এ ধরনের কথা বলায় অনেকেই আমার উপর নাখোশ হবেন। সে কারণে ভবিষ্যতে এ বিষয়ের উপর আরো তথ্যনির্ভর গবেষণামূলক প্রবন্ধ বা বই লেখার ইচ্ছা রইল।

www.pathagar.com

(৭) শাসন বিভাগ

এ ধরনের সচিব, যুগ্মসচিব, ডি. সি, এস. পি, দারোগা দিয়ে জনকল্যাণমুখি রাষ্ট্র গড়া সম্ভব নয়

সরকারের ৩টি বিভাগ—শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইন বিভাগ। আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে এতক্ষণ কিছু বক্তব্য রেখেছি। এবার আমি শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলব। শাসন বিভাগ চালায় দু'ধরনের ব্যক্তিরা। নির্বাচিতরা ও আমলারা। নির্বাচিতদের সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। কিভাবে নির্বাচন হয়, কারা নির্বাচিত হয়, কোন শ্রেণী থেকে তারা আগত, কোন শ্রেণীর তারা সেবা করে তা আগেই বলেছি। তাদের নির্বাচন জয়ের মূল মাপকাঠি অর্থ তাও বলেছি। এরা নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর প্রথম বছর ব্যস্ত থাকেন কিভাবে নির্বাচনী ব্যয় তোলা যায় তার চেষ্টায়। পরবর্তী বছরগুলিতে আগামী নির্বাচনের ব্যয় জমা করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকেন এবং আরো চেষ্টায় থাকেন কিভাবে দামী গাড়ি বাড়ী ও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স করা যায়। গম চুরি, কম্বল চুরি, আদম পাচার, চোরাচালানী ময় তদবির, দালালী কোন কিছুই এদের বাদ যায় না। নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে তারা দেশটাকে মনে করেন তাদের বাপের তালুক। কিন্তু এর পরেও এদের নীচে যে শ্রেণীটি নীরবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকেন, প্রকৃত ক্ষমতার মালিক যারা, যাদের হাতে এ নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও খেলার পুতুলে পরিণত হয় তারা হচ্ছে দেশের আমলা সমাজ। সবকিছুর পরেও নির্বাচিতদের অনেক ক্ষেত্রেই পরবর্তী নির্বাচনে যাওয়ার প্রশ্ন থাকে। মান-সম্মান বদনামের একটু হলেও ভয় থাকে। যদিও শোষক শ্রেণীদের স্বার্থেই এসব নির্বাচন হয় এবং সাধারণ শ্রেণীর নির্বাচিত হওয়ার কোন সুযোগ থাকে না, ঘুরে ফিরে এক শ্রেণীর লোকই নির্বাচিত হয়—এসব সম্পর্কে পূর্বেই বলেছি। তারপরেও ভোট ভিক্ষার একটি প্রশ্ন থাকে। কিন্তু আমলারা এসব কিছুর উর্ধ্বে। আমাদের আমলা আর আমলাতন্ত্র এত বেশি শক্তিশালী যে তারা যতবেশি দুর্নীতি করুক না কেন কেউ তাদের স্পর্শ করতে পারে না। এমনকি ক্ষমতা পাল্টালে মন্ত্রী-মিনিষ্টার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অনেক সময় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু আমলারা নিশ্চিন্তে পরের সরকারের তাবেদারীতে লেগে যান। আমলারা তৈরি করেছে মানুষকে শোষণ-শাসন ও নির্যাতন করার বিরাট নেটওয়ার্ক। এই আমলা চক্রের কবলে পড়ে আমরা দিন দিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছি, মৃতপ্রায় হয়ে উঠেছি। রাষ্ট্রকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে এরা এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে দেশকে জনকল্যাণমুখি করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই আমলাদের মানসিকতা হলো

www.pathagar.com

ইংরেজ প্রভুদের মতো। জনগণকে সেবা করার মতো কোন মন-মানসিকতা গড়ে উঠেনি এদের। অবশ্য ঐতিহাসিক কারণেই এটা হয়েছে। আমলাতন্ত্রের বয়স আমাদের দেশে প্রায় দুইশত বৎসর, ইংরেজরাই এটি প্রচলন করেছে। ইংরেজ সৃষ্ট এই কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু ছিল জেলা ভূমি কালেক্টর। যার মূল কাজ ছিল ভূমি-রাজস্ব আদায় করা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বৃটিশের স্বার্থে শোষণ-নিপীড়ন করা। তাদের অবাধ লুণ্ঠনের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং এর মাধ্যমে ইংরেজের পদলেহী একটি এলিট শ্রেণী তৈরি করা, যারা জাতিতে এ দেশীয় এবং মগজে বৃটিশ। এরাই প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসনের নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রায় সোয়াশত বছর পর্যন্ত নির্বাচিত জন প্রতিনিধি কর্তৃক রাষ্ট্র পরিচালনার কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। পরবর্তীতে নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু হলেও ইতিমধ্যে আমলাতন্ত্র ফাইলের মধ্যে ও মনমানসিকতায় যে গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসে তা আরও দূর করা সম্ভব হয়নি এবং আজো তা অক্ষয় অব্যয় হয়ে রয়েছে। আমলাতন্ত্রের বিশাল নেটওয়ার্ক ভাঙ্গা সম্ভব হয়নি এবং কেউ এ ই ব্যাপারে কিছু করতেও পারেনি। অন্যদিকে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশ পরিচালনায় অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ ও অকর্মণ্য হওয়ায় তারা এই আমলাদের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। আমলাদেরকে চটালে তাদের পক্ষে কোন কিছুই করা সম্ভব হয় না। আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং মন্ত্রীরা এমনই অযোগ্য যে নিজ বুদ্ধিতে তাদের অনেকের পক্ষেই একটি ইউনিয়ন কাউন্সিলও চালানো সম্ভব নয়। রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কে তাদের নূন্যতম জ্ঞান না থাকায় তারা আমলাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আমলারাও তাদেরকে মনে করে মৌসুমের পাখি। আমলারাই নির্বাচিতদের দুর্নীতির সব পথ বাতলে দেয়, ফাইলপত্র ঠিক ক'রে দেয়। এতে তারা একদিকে কমিশন পায়, অন্যদিকে নিজস্ব দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারীতার সুযোগ পায়। আমলা আর নির্বাচিতরা হয়ে দাঁড়ায় দুজনে-দুজনার। আমলাতন্ত্রের কারণেই দুর্নীতিবাজ শাসকরা ক্ষমতায় বসতে পারে। আমলারাই যে রাষ্ট্র পরিচালনা করে তার প্রমাণ পাওয়া যায় এথেকে যে আমাদের দেশে একের পর এক সরকার ক্ষমতায় বসলেও শাসন পরিচালনায় আজ পর্যন্ত কোন গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়নি। এপর্যন্ত আমরা ১২জন রাষ্ট্রপতি পেয়েছি। প্রায় সাড়ে তিনশত মন্ত্রী পেয়েছি, অথচ অবস্থা কমবেশি একই রয়ে গেছে। একই ধরনের রাষ্ট্র পরিচালনা প্রত্যেকটি সরকারই ক'রে থাকে। প্রত্যেক সরকারই একই ধরনের বাজেট দিয়ে থাকে। যার বিরুদ্ধে সকল বিরোধী দল একই ধরনের সমালোচনা ক'রে আসছে। জাতীয় পার্টির আমলে যে বাজেট দেয়া হতো তার সমালোচনা বি, এন, পি, আওয়ামী লীগসহ সবাই যে ভাবে করেছে, বর্তমান বি, এন, পি'র বাজেটের বিরুদ্ধেও জাতীয় পার্টি, আওয়ামী লীগসহ সবাই একই ভাষায় করছে। কাল আওয়ামী লীগ বাজেট দিলে বি, এন, পি, জাতীয় পার্টি সহ সবাই একই ভাষায় সমালোচনা করবে। এযেন ভদ্রলোকের এক কথা। সরকার পরিবর্তন হলেও যেহেতু

www.pathagar.com

আমলাদের পরিবর্তন হয় না এবং যেহেতু আমলারাই দেশ পরিচালনা করে সেহেতু বাজেট সহ সমুদয় রীতিনীতি একইরকম হয় সব সরকারের আমলেই। বাজেট আমলারাই তৈরি ক'রে থাকে। এ ধরনের দুর্বল ও দিক নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ ও আমলানির্ভর সরকারগুলি রাষ্ট্র পরিচালনায় বার বার ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। আমলাদের ক্ষমতা অসীম। সরকার তাদের খেলার পুতুল। আমলারা সরকারের মন্ত্রীদেরই যেখানে তোয়াক্কা করে না, তাদেরকে মৌসুমী পাখি মনে করে, সেখানে জনগণের স্বার্থে কোন কিছু করার প্রশ্নই উঠে না বা জনগণকেই ভয় করার কোন প্রশ্নও উঠতে পারেনা। এই আমলারাই বিদেশী সাহায্য আনে, দেশকে পঙ্গু ক'রে গড়ে তোলে, সরকারকে তারা সকাল বিকাল নাকানী-চুবানী খাওয়ায়। এরা বেতন কম পায়, ঘুষ বেশি খায়। ৫/৭ হাজার টাকা বেতনের আমলারা স্বনামে, বেনামে যে সম্পদ গড়ে তোলে তা এই গরীব দেশে অকল্পনীয়। রাজনীতিবীদদের সাথে আমলাদের বাড়ী-গাড়ি সম্পদের তুলনা করলে দেখা যাবে আকাশ-পাতাল তফাৎ। অথচ হিসাব মতে রাজনীতিবীদরা রাষ্ট্র পরিচালক আর আমলারা হুকুমের কর্মচারী। এদের নেটওয়ার্কের কারণেই রাষ্ট্র হয়ে উঠে আমলা ও পুলিশ নির্ভর। বৃটিশ সৃষ্ট এই প্রভু মনোবৃত্তি সম্পন্ন আমলাদের দিয়ে রাষ্ট্র তথা জনগণের কোন মঙ্গল সাধিত হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত জনগণ নিজেরা ক্ষমতার অধিকারী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমলাদের খপ্পর থেকে দেশকে বাঁচানো কোনমতেই সম্ভব নয়। এ ধরনের সচিব, যুগ্ম সচিব, সহকারী সচিব ময় ডি সি, এস পি, দারোগা দিয়ে জনকল্যাণমুখি রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তবে মনে রাখতে হবে যে, শোষণ ও লুটপাটের স্বার্থেই এই আমলাতন্ত্র সৃষ্টি হয়েছিল এবং এখনো তা টিকে রয়েছে। আমাদের বর্তমানকার কাঠামোর ফলশ্রুতি হচ্ছে আজকের আমলারা। গণশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এ ধরনের আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের বিলোপ সাধন ক'রে জনকল্যাণমুখি প্রশাসনিক ব্যবস্থা তথা রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব এবং যেহেতু আমরা নতুন সমাজ গড়তে বদ্ধপরিকর সেহেতু স্বভাবতই এই আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে গণশাসনের উপযোগী প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার বিকল্প কোন পথ আমাদের হাতে নেই। সে প্রশাসনিক কাঠামো হবে জনগণের স্বার্থে, জনগণের নিয়ন্ত্রাণাধীন এবং জনগণ দ্বারা পরিচালিত।

www.pathagar.com

(৮) দায়িত্বহীন গণতন্ত্র

আমরা গণতন্ত্রের কথা বলে থাকি। তথাকথিত এই গণতন্ত্রে সবাই সমান প্রকৃতপক্ষে শোষক ও সুবিধাবাদী শ্রেণীর গণতন্ত্র। এই সমাজের গণতন্ত্র হচ্ছে ব্যাপক জনগণকে শোষণ করার মুষ্টিমেয়দের গণতান্ত্রিক অধিকার। এই সমাজে যাদের অর্থ নেই বাস্তবপক্ষে তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকার এমনকি বেঁচে থাকার নূন্যতম অধিকারও নেই বা থাকে না। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাধারণত বুর্জোয়া শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার ও নিছক সাধারণ লোকের উপর অত্যাচারের হাতিয়ার মাত্র। এটা হচ্ছে দায়িত্বহীন গণতন্ত্র। অর্থাৎ এই গণতন্ত্র মানুষের সত্যিকারের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকারই শুধু হরণ করেছে তা নয়, এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা মানুষের খাওয়া পরার নূন্যতম দায়িত্বটুকুও নেয় না। গণতন্ত্র এখানে মুখের কথা মাত্র। অর্থ এখানে সকল কিছুর মাপকাঠি। অর্থ না থাকলে শুদামে যত খাদ্যই থাক তাকে ক্ষুধার্ত থাকতে হবে। যত মেধাবী ছাত্রই হোক স্কুলে যাওয়ার সুযোগ তার থাকবে না। অসুস্থ থাকলেও ডাক্তার দেখানো, ঔষধ কেনা বা চিকিৎসার সুযোগ নেই। প্রচন্ড শীতে টুলেটওয়ালা বাড়ীর গেটে মারা গেলেও ভেতরে ঢোকার অধিকার নেই। একটুকরা কাপড়ের অভাবে উলঙ্গ থাকলেও কারো বিন্দুমাত্র আসে যায় না। আমাদের এমন এক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে গণতন্ত্র শুধুমাত্র সঠিক রাজনৈতিক অধিকারই প্রতিষ্ঠা করবে না, সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানুষের বেঁচে থাকার দায়িত্বও গ্রহণ করবে। অর্থাৎ গণতন্ত্র হতে হবে দায়িত্বশীল, গণতন্ত্র হতে হবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই। অর্থনৈতিক জীবনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলেই রাজনৈতিক জীবনে গণতন্ত্রের পূর্ণতা আসে।

(ক) জনগণকে রাজনীতির প্রভু হতে হবে

স্বাধীন স্বনির্ভর দেশ গড়ে দেশের প্রতিটি মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে এবং জনগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ও উন্নত সাংস্কৃতিক জীবনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে জনগণের নিজস্ব একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অর্থাৎ জনগণকে রাষ্ট্র ও ক্ষমতার প্রভু হতে হবে। জনগণ যখন রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ ক'রে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রভু হয় কেবল তখনই তারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা ক'রে স্বাধীন ও সৃজনশীল জীবন পরিচালনা করতে পারে। শোষক সমাজে যেখানে একের সঙ্গে অপরের স্বার্থের সংঘাত হয়, যেখানে পুরো সমাজ কাঠামোই শোষণের উপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠে, যেখানে সমাজের

www.pathagar.com

সর্বত্র শোষণ বিদ্যমান, সেখানে সকল জনগণের স্বার্থ পূরণ ক'রে কোন রাজনীতি থাকতে পারে না। সেখানে রাজনীতির প্রভু হচ্ছে শোষক গোষ্ঠী। সেই কারণে শুধুমাত্র যখন জনগণ ক্ষমতা পায় তখনই কেবল তারা রাজনীতির প্রভু হয়, তারা সমাজের প্রভু হতে পারে এবং তাদের দাবী ও স্বার্থ পূরণ করতে পারে। তখন তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে এবং সমাজের সকল ক্ষেত্রে স্বাধীন ও সৃজনশীল জীবন যাপন করতে পারে। শুধুমাত্র যখন জনগণ রাজনীতির প্রভু হতে পারে তখন তারা তাদের অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনের প্রভু হতে পারে। রাজনীতিতে স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হলে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে হবে। এটা হচ্ছে জনগণের সম্মিলিত শক্তি। যখনই শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলা যায় এবং তাদের উপর নির্ভর করা যায় তখনই তারা কৃতকার্য হয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারে এবং সার্বভৌমত্বকে রক্ষা ক'রে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারে।

(খ) নির্বাচন ব্যবস্থা

গরীব মানুষের শাসন মানে গণতন্ত্রের শাসন

জনগণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে জনগণকে রাষ্ট্রের ক্ষমতা গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য নির্বাচন ব্যবস্থার দিকে নজর দেয়া প্রয়োজন। পুঁজিবাদী সমাজে জনগণ কখনই তাদের সঠিক প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে না। গণতন্ত্র অর্থ বেশি লোকের শাসন এবং নির্বাচন শাসন গ্রহণের প্রক্রিয়া। এটা পুঁজিবাদীদের শ্লোগান ও কর্মপন্থা। সামন্তবাদী সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজে উত্তরণের জন্য ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে পুঁজিবাদীরা গণতন্ত্রের শ্লোগান দেয় ও এই নির্বাচনের প্রক্রিয়া গ্রহণ করে। আপাতদৃষ্টিতে এটা খুবই ন্যায্য এবং সঠিক প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমেই পুঁজিবাদীরা সামন্তবাদীদের বিরুদ্ধে জনগণকে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করে। পুঁজিবাদী সমাজে গণতন্ত্র যে কি ধরনের ফাঁকাবুলি তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ সমাজে যার অর্থ নেই অর্থাৎ যে শোষক শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত নয় তার পক্ষে নির্বাচিত হওয়া দুরুহ ব্যাপার। এ নির্বাচন অর্থ টাকার খেলা। সততা, দেশপ্রেমিকতা, জনগণের মঙ্গল চিন্তার এখানে কোন মূল্য নেই। কেউ কোনভাবে নির্বাচিত হলেও সে যত দেশপ্রেমিকই হোক না কেন তার পক্ষে কল্যাণকর কোন কিছুই করা সম্ভব নয়। এ ধরনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা রক্ষা করা তথা শোষক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা ছাড়া জনকল্যাণমুখি কোন কিছুই করা সম্ভব নয়। যেহেতু রাষ্ট্র ও সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয় শোষক শ্রেণীর দ্বারা এবং এসব নির্বাচিত প্রতিনিধিরা একদিকে শোষক শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত অন্যদিকে শোষক শ্রেণীদের নিকট বাঁধা থাকায় তারা

www.pathagar.com

ভাল কিছুই করতে পারেনা। আর শোষক শ্রেণীর কারণেই রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদের নিকট দায়বদ্ধ থাকায় এদেরকে সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে হয় এবং তাদের নির্দেশে দেশ চালাতে হয়। আমরা অনেক নির্বাচন করেছি কিন্তু কখনো শুনেছি কি যে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে গরীব মানুষের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছে? কখনো শুনেছি কি যে জনগণের ৫টি মৌলিক দাবী পূরণ করার জন্য শাসনতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা কেউ বলেছে? সংসদে তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতেই ব্যস্ত থাকে। নিজেদের মধ্যে বেহুদা ঝগড়াঝাঁটি কাদা ছোড়াছুড়ি, আবার কোন সময় হাস্য-কৌতুক করতেই তারা ব্যস্ত থাকে। আবার নিজেরা যত ঝগড়াঝাঁটিই করুক না কেন নিজেদের জন্য ট্যাক্স-ফ্রি গাড়ি পাওয়ার সময় সরকার বিরোধী দল সব এক, কেউ বলে না যে জনগণকে বঞ্চিত ক'রেই তারা এই সুযোগ নিচ্ছে। দেখতে পাই বাইরে যখন জনগণ ধুঁকে ধুঁকে মরছে তখন দুইনেত্রী তাদের সাংসদদের নিয়ে নিজেদের বেতন ও সুযোগ সুবিধা বাড়াতে ব্যস্ত। আসলে এ ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কোন সময়ই জনগণের সামাজিক অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে পারে না। গণতন্ত্র মানে বেশি মানুষের শাসন। বেশির ভাগ মানুষ গরীব না বড়লোক। অবশ্যই গরীব। তা'হলে গরীব মানুষের শাসন মানেই গণতন্ত্রের শাসন। কিন্তু আমরা কি কল্পনা করতে পারি একজন অতিসাধারণ গরীব মানুষ বা কৃষক বা শ্রমিক সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হবেন বা রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কোনভাবে দুই একজন নির্বাচিত হয়ও তবে সে উপর শ্রেণীতে ওঠার জন্য ব্যস্ত হয়ে জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ ক'রে থাকে। বিষয়টি দুই একজনের ব্যাপার নয়। বিষয়টি গোটা সমাজ ব্যবস্থার। কোরিয়ায় আমরা দেখতে পাই তাদের পার্লামেন্টের ৩৭ ভাগ ডেপুটি অর্থাৎ সংসদ সদস্য হচ্ছেন কারখানার শ্রমিক, ১০ $\frac{১}{২}$ভাগ কৃষক, ২০ ভাগ মহিলা। আরও রয়েছে শিক্ষক, ডাক্তার, টেকনিশিয়ান, বুদ্ধিজীবী, পার্টিকর্মী এবং বিভিন্ন পেশার লোক। কয়লা খনির গভীর অন্ধকারে কাজ করে এমন শ্রমিক অথবা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরে এমন জেলে বা মাঠে কাজ করে এমন কৃষক বা ট্যাক্সীর ড্রাইভার সেখানে সংসদ সদস্য রয়েছে। তারা সেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হতে পারে। তবে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। আমাদের এই অশিক্ষিত শ্রমিক বা কৃষক সংসদ সদস্য হয়ে কি করবে। আসলেই কিছু করতে পারবে না। দেশ চালাতে হলে বিদ্যাবুদ্ধির দরকার হয়। তা'হলে কোরিয়ায় কিভাবে করে। সেখানে দেশের সমস্ত মানুষকে বুদ্ধিজীবীতে রূপান্তর করা হয়েছে। কল-কারখানা, কৃষি সমবায় ও কর্মস্থলে কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রত্যেককে নিয়মিত

www.pathagar.com

লেখাপড়া করতে হয়। সমস্ত বিষয় তাদের লেখাপড়ার অন্তর্ভূক্ত থাকে। ফলে নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে প্রতিটি লোক সেখানে যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করে। এককথায় পুরো সমাজটাই সেখানে বুদ্ধিজীবীর সমাজ। অশিক্ষিত বুদ্ধিহীন জনগণ দিয়ে ভাল রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। (শিক্ষা সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে।)

কোরিয়ার জনজীবন ও রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যক্তি বিশেষের অর্থ ও ক্ষমতার মানদন্ড বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে জনগণের সঠিক প্রতিনিধিত্ব ও তাদের স্বার্থ রক্ষা করা। আমরা সেভাবে যদি জনগণের স্বার্থ রক্ষা করার মতো সরকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারি এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে না পারি তা'হলে বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন রাস্তা নেই। নতুন ধরনের কাঠামো প্রতিষ্ঠা ছাড়া বর্তমান কাঠামো বহাল থাকা অবস্থায় কারো পক্ষেই দেশের জনগণের মঙ্গল সাধন করা সম্ভব নয়। সে বি এন পি হোক, আওয়ামী লীগ হোক, জাতীয় পার্টি হোক আর আমরাই (পিপলস্ লীগ) হই না কেন।

www.pathagar.com

(৯) অন্ন বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা ও শিক্ষার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করাই আমাদের মূল লক্ষ্য

বাংলাদেশ পিপলস্ লীগ গণশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করতে বদ্ধপরিকর। আগেই বলেছি আমরা শাসনতন্ত্রে এসব মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে জনগণকে এসব অধিকার প্রদান করা। আমাদের দলীয় পতাকায় রয়েছে সবুজ ভূমির উপর ৫টি তারকা। শ্যামল সবুজ ভূমির উপর ৫টি তারকা দ্বারা আমরা বুঝাতে চাই —মানুষের ৫টি মৌলিক চাহিদা তথা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য ও দায়িত্ব। এই ৫টি বিষয় নিয়ে এখন কিছু আলোচনা করা যাক।

(ক) খাদ্য সমস্যা

কার খাবার কে খায়

খাদ্য সম্পর্কে আগেই বলেছি আমাদের দেশ শুধু খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে তাই নয় বরং বাংলাদেশ বিশ্বের খাদ্যের এক গোডাউন হতে পারে। যদিও আমাদের দেশ ছোট—মানুষ বেশি। তথাপি এখনো আমাদের মাথা পিছু চাষাবাদ যোগ্য জমির পরিমাণ অনেক দেশের চেয়ে বেশি। যেখানে মাথাপিছু চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ চীনে ০.১৩ হেক্টর, ভিয়েতনামে ০.১০ হেক্টর, জাপানে ০.০৭ হেক্টর, কোরিয়ায় ০.০৬ হেক্টর, হল্যান্ডে ০.০৬ হেক্টর সেখানে আমাদের পরিমাণ ০.১৬ হেক্টর। আগেই বলেছি আমাদের $\frac{১}{৩}$ভাগ জমিতে যদি আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতে পারি তা'হলে শুধু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণই নয়, বরং বিদেশেও রপ্তানি করতে পারি। আরেকটি কথা খাদ্যাভাস পরিবর্তনের বিষয়টিও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। জাপানে মাথাপিছু চাল উৎপাদন আমাদের তুলনায় প্রায় অর্ধেক, কিন্তু তারা অন্যান্য খাদ্য গ্রহণের ফলে নিজেদের চাহিদা মিটিয়েও প্রচুর চাল রপ্তানি ক'রে থাকে। যাহোক মূল কথায় ফিরে যাই। শুধু খাদ্য উৎপাদন করলেই হবে না, তার বন্টন ব্যবস্থাও অতি জরুরী। আমরা দেখেছি অনেক খাদ্য হাতে থাকা সত্ত্বেও দেশের মানুষ অনাহারে থাকে বা খাদ্যাভাবে মৃত্যুবরণ করে। শুধু উৎপাদন বৃদ্ধিই আমাদের প্রধান সমস্যা নয়। তার সাথে জমির মালিকানা সম্পর্ক এবং বন্টন ব্যবস্থার প্রশ্নও জড়িত রয়েছে। দুর্ভিক্ষের সময়গুলিতে আমাদের যথেষ্ট খাদ্যমজুত থাকা সত্ত্বেও অনেক লোক মৃত্যুবরণ করেছে। বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশ যদি সম্পূর্ণরূপে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয় তা'হলে বিদেশীরা খয়রাতী চাল-গম আর সাহায্য হিসাবে দিবে না। ফলে

www.pathagar.com

কাজের বিনিময়ে খাদ্য বিতরণের কর্মসূচীর মতো কর্মসূচী বন্ধ হয়ে যাবে। এতে আমাদের যে লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন নিঃস্ব মানুষ এ ধরনের কর্মসূচীর ফলে বেঁচে আছে তারা মৃত্যুবরণ করবে। কারণ নিজেদের ঘরে খাদ্য থাকলে বিদেশীরা আর তখন খয়রাতী চাল-গম দিবে না, অন্যদিকে সরকারের পক্ষেও এই বিপুল পরিমাণ খাদ্য নগদ মূল্যে বাজার থেকে কিনে এভাবে বিতরণ করা সম্ভব হবে না। আবার এত কষ্ট ক'রে খাদ্যশস্য উৎপাদন করলেও আমরা কৃষককে তার মূল্য দিতে পারছি না। তাদের উৎপাদন খরচাও উঠে না। এ ব্যাপারে পরে বিশদ আলোচনা করার ইচ্ছা রইল। শুধু একটি কথা বলে রাখা দরকার। আমাদের কৃষকরাই এখন পর্যন্ত দেশটিকে টিকিয়ে রেখেছে। তারা স্ব-উদ্যোগে স্বাধীনতার পর থেকে উৎপাদন দ্বিগুণের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। রাষ্ট্রীয় আনুকুল্য দেয়াতো দূরের কথা বরং বিশ্বব্যাংকের নির্দেশে সার, কীটনাশক, ডিজেল ও অন্যান্য কৃষি উপকরণের মূল্য আমরা বাড়িয়েই চলছি। আমাদের কৃষকরা যদি এভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি না করত তা'হলে আমরা ভদ্রলোকেরা শিল্প ও ব্যবসার নামে যে ভাবে লুটপাট করেছি ও করছি তাতে দেশটি এতদিনে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা। কৃষকরাই এখন পর্যন্ত দেশটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। নইলে এতদিনে আমরা হতাম এশিয়ার সোমালিয়া।

খালেদা জিয়া ডাল-ভাতের শ্লোগান দিয়েছেন। মাঝে মধ্যে মাছ-মাংস যাও খেতাম তা আর তিনি খেতে দিবেন না। শুধু ডাল আর ভাত খাওয়াবেন। যা হোক ঠাট্টা নয়। নিঃসন্দেহে ডাল-ভাতের কর্মসূচী একটি ভাল কর্মসূচী। যে দেশের অর্ধেক মানুষ দুই বেলা খাবার পায় না সে দেশের সব মানুষকে যদি ডাল-ভাতের নিশ্চয়তা দেয়া যায় তাহলে অবশ্যই তা একটি ভাল কর্মসূচী। তবে কিভাবে তিনি তা বাস্তবায়িত করবেন তা বলেননি। ডাল-ভাতের শ্লোগান দিয়েছিলেন শেরেবাংলা এ, কে, ফজলুল হক ১৯৩৭ সালে। এ শ্লোগান দিয়ে তিনি পেয়েছিলেন বিরাট জনপ্রিয়তা। কিন্তু ডাল-ভাত আর তিনি তাঁর সারা জীবনেও খাওয়াতে পারেননি। গত ৫৫ বৎসর ধরেও বাঙ্গালীর কপালে ডাল-ভাত আর জুটল না। আজ আবার ক্ষমতায় যাওয়ার আগের আপোষহীন, ক্ষমতায় যাওয়ার পর আপোষকামী নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সেই সস্তা শ্লোগান দিয়ে শেরেবাংলার মত বাজিমাত করতে চাচ্ছেন অর্থাৎ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে চাচ্ছেন বেশি করে। তিনি ১৯৩৭ সন আর ১৯৯৩ সনের পার্থক্য ভুলে গেছেন। এই কাঠামোতে শেরেবাংলাও ডাল-ভাত দিতে পারেননি। খালেদা জিয়াও দিতে পারবেন না। আর এখন শুধু ডাল-ভাতে মানুষ খুশি হবে না, একটুকরা মাছ বা মাংসও তারা চায়।

যদিও আমাদের দেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ কৃষির সাথে জড়িত তথাপি তারা আজও সামন্তবাদী শোষণের নাগপাশ হতে মুক্তি না পাওয়ায় এখনও নিপীড়িত ও নিঃগৃহীত হয়ে চলেছে। সামন্তবাদী ব্যবস্থা হতে আমরা

www.pathagar.com

এখনও মুক্তি পাইনি এবং এর গতিও উত্তরণমুখি নয়। সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক নিপীড়িত দেশে এটাই স্বাভাবিক। একটি সামন্তবাদী দেশ স্বাধীন হলে সেখানে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটতে থাকে এবং শহরের পুঁজি ক্রমশঃ গ্রামে গিয়ে কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটায় অর্থাৎ চাষাবাদের ক্ষেত্রে কৃষিতে পুঁজিবাদের উন্মেষ ঘটে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক নিপীড়িত দেশে পুঁজিবাদ বিকাশ লাভ ক'রে দেশটি যাতে উন্নত না হয় তার জন্য সাম্রাজ্যবাদ অত্যন্ত তৎপর থাকে। কারণ সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদী বিকাশের মাধ্যমে দেশটি যদি উন্নত হয় তাহলে সাম্রাজ্যবাদের অবাধ লুণ্ঠন চালানো সম্ভব হয় না। দেশটি যত অনুন্নত থাকে, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ততই বিস্তৃত করা সম্ভব হয়। আমাদের কৃষি ব্যবস্থায় কিভাবে সামন্তবাদী শোষণ বিদ্যমান এবং আমাদের কৃষি ব্যবস্থার বর্তমান রূপ কি সে সম্পর্কে আমার গণশাসন বইতে বেশ কিছু তথ্য ও বক্তব্য দিয়েছি। আমরা যেমন সামন্তবাদের সকল শিকল ছিন্ন করতে চাই তেমনি সেখানে পুঁজিবাদী শোষণকেও আর অনুপ্রবেশ করতে দিতে পারি না। তাই মূল কর্তব্য হচ্ছে ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ক'রে সকল ক্ষেত্র হতে মধ্যস্বত্বভোগী পরগাছা শ্রেণীকে উচ্ছেদ ক'রে কৃষকের হাতে জমি প্রদান করা। অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রে মৌলিক সংস্কার সাধন করার নীতি গ্রহণ করা এবং তা না করতে পারলে উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে না বা কিছু বৃদ্ধি পেলেও তা দ্বারা সাধারণ কৃষক জনগণের কোন লাভ হবে না এবং কৃষকের মুক্তিও আসবে না। যারা চাষাবাদের মালিক, তারা যদি ফসলের মালিক না হয়, যে খাবার উৎপাদন করে সে যদি খেতে না পায় অর্থাৎ উৎপাদক শ্রেণীর হাতে যদি উৎপাদন না আসে তা'হলে কোন ভাবেই মুক্তি আসতে পারেনা। অনুৎপাদক শ্রেণীর মাধ্যমে কোন কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। কৃষিতে জনগণের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। মানুষের যেখানে স্বার্থ না থাকে সেখানে মানুষ কোন উৎসাহ বোধ করে না বা সেখানে মানুষ শ্রম ও মেধা ব্যয় করতে চায় না। যেমন ধরুন সরকারের খাল কাটা কর্মসূচী। স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে যা করার কথা। নিঃসন্দেহে এটি একটি ভাল কর্মসূচী। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, যেখানে দেশের ৭০ ভাগ লোক ভূমিহীন, সেখানে যার জমি নেই অর্থাৎ খাল কাটার সাথে যার প্রত্যক্ষ স্বার্থ নেই সেই ভূমিহীন কৃষক কোন স্বার্থে অপরের জমিতে বেশি ফসল ফলানোর জন্য খাল কাটতে যাবে। কৃষক যদি এভাবে ভূমিহীন না থাকত, যদি তারা নিজেরাই ভূমির মালিক হতো, তা'হলে আপন মনের ইচ্ছায় আপন স্বার্থেই তারা এ ধরনের খাল কাটার কর্মসূচীতে উদ্যমের সাথে অংশ নিত। কাজেই আজ আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সত্যিকার উৎপাদক শ্রেণী অর্থাৎ কৃষকের হাতে জমি প্রদান করা। সামন্তবাদী শাসন শোষণের মূলচ্ছেদ ঘটিয়ে নতুন ভূমি ব্যবস্থা প্রচলন করা। এ পর্যন্ত আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি ভূমি সংস্কারের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু কোনটিই সত্যিকার অর্থে সাফল্য লাভ করেনি বা কৃষককে মুক্তি দিতে পারেনি। কোন ভূমি সংস্কারই কৃষিতে

www.pathagar.com

সামন্তবাদী শোষণের অবসান ঘটিয়ে কৃষকের মুক্তি নিশ্চিত করতে পারেনি। ফলে আমাদের কৃষকরা ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের ভূমিহীন হওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ভূমিহীন হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে দু'একটি কথা বলে এ বিষয় শেষ করব। ১৯৪৮ সনে আমাদের দেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৬ ভাগ, ১৯৬৩ সনে তা ২৩ ভাগ, ১৯৭৩ সনে ৩৩ ভাগ, ১৯৮২ সনে ৬০ ভাগ এবং আজকে তা ৭০ ভাগ ছাড়িয়ে গিয়েছে। কিভাবে ও কি কারণে ক্রমান্বয়ে বেশি মানুষ ভূমিহীন হয়ে পড়ছে তা দেখা যাক। মনে করুন আমার ১০ বিঘা আর আপনার ১৫ বিঘা জমি রয়েছে এবং বৎসরে আমাদের উভয়ের প্রয়োজন ১২ বিঘার ফসল। তা'হলে দেখা যাবে বৎসর শেষে আমার ২ বিঘার ফসল টান পড়ছে এবং আপনার হাতে তিন বিঘার ফসল উদ্বৃত্ত রয়েছে। বৎসর শেষে আমার আর কোন পথ না থাকায় (এর সাথে ঘরপোড়া, মেয়ে বিয়ে দেয়া, অসুখ-বিসুখ, দুর্ঘটনা ইত্যাদি যদি ঘটে তা'হলে তো কথাই নেই) জমি বিক্রি করা ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না। আমার জমি কে কিনবে। তা আপনিই কিনবেন। কারণ আপনার হাতে তিন বিঘা জমির ফসলের টাকা উদ্বৃত্ত রয়েছে। ধরুন প্রথম বৎসর আমি একবিঘা জমি বিক্রি করলাম এবং আপনি তা কিনলেন। ২য় বৎসর তা'হলে আমার ঘাটতির পরিমাণ আর এক বিঘার ফসল বেড়ে গেল অর্থাৎ ২ বিঘার জায়গায় ৩ বিঘার ফসল ঘাটতি হল এবং আপনার হাতে তিন বিঘার স্থলে ৪ বিঘার ফসল উদ্বৃত্ত হল। ফলে ২য় বৎসর শেষে আমাকে আগের বৎসরের তুলনায় আরও বেশি জমি বিক্রি করতে হল। আর আপনি আরও বেশি জমি ক্রয়ের ক্ষমতা অর্জন করলেন। এইভাবে তৃতীয় বৎসর আমাকে আরও বেশি জমি বিক্রি করতে হল এবং আপনার হাতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ আরও বেড়ে গেল। এভাবে চলতে চলতে আমি কয়েক বৎসরের ভিতরে সম্পূর্ণ ভূমিহীনে পরিণত হলাম এবং আপনার উদ্বৃত্তের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় আপনি ক্রমশঃ বেশি জমি কিনে বিস্তর জমির মালিক হয়ে উঠলেন। ভূমিহীন হওয়ার এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে বলেই কোন ভূমি সংস্কারই কাজে দেয়নি। এর সঙ্গে সুদখোর মহাজন ও সরকারী আমলাদের শোষণ, নিষ্পেষণতো রয়েছেই। আজকে যারা ঢাকা শহরের বস্তিতে ফুটপাতে থাকে বা ভিক্ষা করে তাদের সবারই একদিন কিছু না কিছু জমি ছিল। একদিকে যেমন কৃষকের হাতে ভূমি প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে অন্যদিকে কৃষকরা যাতে শোষণের যাঁতাকলে পড়ে ভূমিহীন না হয় সে ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে। এখানে এ ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা সম্ভব নয়। গণশাসন বইতে এ সম্পর্কে বিষদভাবে বলা হয়েছে। এর জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যাদের স্বার্থে এই মৌলিক সংস্কার, সেই কৃষক সমাজকে জাগ্রত করা, তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা। তাদেরকে সুসংগঠিত ক'রে অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন ক'রে গড়ে তুলতে না পারলে কোন ধরনের মৌলিক কৃষি সংস্কার সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

(খ) বস্ত্র সমস্যা

আমরাই একদিন ভারতবর্ষ ও ইউরোপের কাপড়ের চাহিদা মেটাতাম

এই বাংলা একদিন সমগ্র ভারতবর্ষসহ ইউরোপের কাপড়ের চাহিদা মিটাত। ইংরেজদের আগমনের পূর্বে এই বাংলা ছিল একটি রপ্তানিকারক দেশ। আমাদের কোন কিছুই আমদানী করতে হত না। আমরা শুধু রপ্তানি করতাম। একটি সমৃদ্ধশালী দেশ ছিল আমাদের। একসময় আমাদের রপ্তানিকৃত পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সূতি কাপড়, মসলিন, রেশমী বস্ত্র, চাউল, চিনি, আদা, লঙ্কা, গুড়, তামাক, সুপারী, পাট, লবন, গাঁজা, আফিম, মসলা, ঔষধ, এমনকি মুক্তা, পান্না ইত্যাদি। বঙ্গের সূতিবস্ত্র রেশমবস্ত্র মসলিন তুরস্ক, সিরিয়া, পারশ্য, আরব উপদ্বীপ, ইথিওপিয়া, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান, সিংহল, মালাক্কা, সুমাত্রা, এমনকি সুদূর জাপান ও ইউরোপেও রপ্তানি হত। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এ বঙ্গের সমৃদ্ধি ছিল বিস্ময়কর। অদৃষ্টের পরিহাস সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ফলে আমরা শুধু আমদানীকারকই নই, একটি ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত হয়েছি। একদিন বাংলার কার্পাস ও রেশম শিল্প বিশ্বের সবচেয়ে উন্নততর শিল্প ছিল। কত বড় গর্ব আমাদের যে, আমাদের পূর্ব পুরুষরা মসলিন কাপড় তৈরি করত। তারা হাতে যে কাপড় তৈরি করত তা আজকের অত্যাধুনিক কারখানায়ও তৈরি করা সম্ভব নয়। কত জঘন্য পন্থায় সে শিল্পকে যে ধ্বংস করা হয়েছে সে এক কাহিনী। অত্যাচার, নির্মমতা, বর্বরতার সে এক ইতিহাস। কি দুর্ভাগ্য আমাদের, যারা একদিন এত দেশের মানুষের পরনের ও সৌখিনতার কাপড় সরবরাহ করেছে, তাদের মা বোনেরা দুই খানা কাপড় পরতে পারে না। জাকাতের একটুকরা কাপড়ের জন্য ভিড়ের চাপে পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে মরতে হয় তাদের। সোহাগীরা অর্ধ-উলঙ্গ থাকে। জাল জড়ায়ে ইজ্জত রক্ষা করতে চেষ্টা করে। এক শাড়ী পরে গোসল ক'রে ভিজা কাপড় গায়ে শুকাতে হয় অনেককে। অথচ আমরা যদি সঠিকভাবে এ দিকে নজর দিতাম তা হলে স্বল্প সময়েই এ সমস্যার সমাধান করতে পারতাম। ক্ষমতায় যারা যায়, তারা যে এটা একদম বুঝে না তা নয়। কিন্তু তাদেরকে যেহেতু বিদেশী বেণিয়াদের স্বার্থে নির্দেশে ও দেশীয় শোষক শ্রেণীর কব্জায় বন্দী থেকে রাষ্ট্র চালাতে হয় সেহেতু জাতীয় শিল্পের বিকাশ ঘটানোর মত পদক্ষেপ নেয়া এদের পক্ষে সম্ভব নয়। দেশীয় মধ্যস্বত্বভোগী ফরিয়াদের নিয়ন্ত্রণে এসব সরকার থাকায় ভিতরেও এরা থাকে অত্যন্ত দুর্বল। আর বাইরে এদের অবস্থা হয়ে উঠে বলির পাঁঠার মত। ফলে জনগণের স্বার্থের পরিপূরক কোন পদক্ষেপ নেয়া এদের পক্ষে সম্ভব নয়। ভিতর ও বাইরে এ ষড়যন্ত্র ও চাপের ফলে তথাকথিত সাহায্যের নামে বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় কাপড়

www.pathagar.com

আমদানী করতে হয়। চোরাচালানীকে প্রশ্রয় দিতে হয়। একদিকে জাপানী ও অন্যান্য বিদেশী কাপড়ে বাজার সয়লাব। অন্যদিকে ভারতীয় শাড়ী হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের মেয়েদের পরনের একমাত্র কাপড়। তাঁত শিল্পকে নানান পন্থায় ধ্বংস করা হচ্ছে। সরকারের নানা ধরনের ট্যাক্স ধার্য ও উদাসীনতার ফলে দেশে উৎপাদিত কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় চোরাচালানীর কাপড়ের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না আমাদের নিজেদের উৎপাদিত শাড়ী ও অন্যান্য কাপড়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই চোরাচালানীর কাপড়ে বাজার ভরে যায়।

আজকে আমাদের তাঁত শিল্পকে বিশেষ করে কুটির শিল্প খাতে তাঁত শিল্পকে রক্ষা ক'রে গণমানুষের স্বার্থ সম্পর্কিত কর্মসূচী গ্রহণ করতে না পারলে কোনভাবেই বস্ত্র সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। দেশীয় তাঁত শিল্পসহ অন্যান্য কুটির শিল্পগুলি আমাদের অর্থনীতির বড় স্তম্ভ। বৃটিশ আসার আগে এই শিল্পগুলি আমাদের সমুদয় চাহিদা মিটাত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তখন আমাদের কোন কিছু আমদানী করতে হতো না। শুধু রপ্তানি করতাম। আজও আমাদের রপ্তানি আয়ের ৬৫ ভাগ আসে কুটির শিল্প থেকে। অথচ এ খাত যে কি পরিমাণ অবহেলিত এবং কাদের স্বার্থে অবহেলিত সে কথা আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। কুটির শিল্পের জন্য ঠিকমতো একটি পৃথক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব হয়নি। অথচ আমাদের এই কুটির শিল্পই সারা বিশ্বে এককালে আমাদেরকে একটি শিল্প সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে পরিচিত করেছিল। আজও এই কুটির শিল্পের প্রসারই পারে আমাদের কাপড় সহ বহু প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত করতে, রপ্তানি আয় বাড়াতে পারে বহু পরিমাণে এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রকে বিদেশের নিকট দায়-দেনা থেকে মুক্ত করতে পারে এবং ব্যাপকহারে বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু আগেই বলেছি জনগণের নিজস্ব সরকার ছাড়া পরমুখাপেক্ষী এবং শোষক গোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল কোন সরকারের পক্ষে জনকল্যাণমুখি কোন কর্মসূচী নেয়া সম্ভব নয় এবং তা নিতে গেলে তাদের গদি উল্টে যায় বা ওরা জাতীয় জীবনে দুর্ভোগ বাড়িয়ে দেয়। আর তা' ছাড়া চরিত্রগতভাবে এই সরকারগুলির সবই শোষকশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।

কোরিয়ার জনগণ তাদের নিজস্ব সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল বলেই সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক নিপীড়িত নিষ্পেষিত হওয়া সত্ত্বেও এবং কোরিয়া যুদ্ধের সময় সমস্ত শিল্প-কারখানা ধ্বংস হওয়া সত্ত্বেও পরনের কাপড়ের জন্য অপরের উপর নির্ভরশীল না হওয়ার নীতি গ্রহণ করায় কোরিয়া অতি স্বার্থকভাবে বস্ত্র সমস্যার সমাধান করছে। যদিও সেখানে তুলা চাষের কোন সুযোগ ছিল না। কিন্তু তারা নিজস্ব প্রযুক্তি দ্বারা এমনকি নলখাগড়ার মতো নানাবিধ জিনিস ব্যবহার ক'রে বস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছে। কেমিক্যাল ফাইবার অর্থাৎ নাইলন, টেটন জাতীয় কাপড় উৎপাদনের মাধ্যমে তারা শুধু

www.pathagar.com

নিজস্ব প্রয়োজনই মেটায়নি তারা আজ বিপুল পরিমাণ কাপড় রপ্তানি ক'রে থাকে। মাথাপিছু তাদের বাৎসরিক কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ ৭৬ মিটার। আমাদের রেশম শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটানো যেতে পারে, আগের মত কার্পাস উৎপাদন করা যেতে পারে। পাট থেকে বস্ত্র তৈরি হতে পারে ব্যাপকভাবে। একসময় এখানে ব্যাপক পাটবস্ত্রের প্রচলন ছিল। কোরিয়ার রাস্তাঘাটে এমন কোন মানুষকে পাওয়া যাবে না যার পরনের কাপড় জীর্ণ-শীর্ণ বা ময়লা। প্রতিটি শিশু, নারী বা বয়স্ক মানুষ সারাদেশে সর্বত্র অত্যন্ত সুন্দর ও পরিপাটি কাপড় পরে। আর আমাদের এই অবস্থার জন্য আমরাই দায়ী। অবস্থা যে কতো ভয়াবহ তা গ্রামে-গঞ্জে গেলেই বুঝতে পারা যায়। গণশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম মূল লক্ষ্য হচ্ছে উলঙ্গ-অর্ধউলঙ্গ অবস্থা থেকে আমাদের আশু পরিত্রাণ পাওয়া।

(গ) বাসস্থান সমস্যা

যেমন আমার আয়ুব খান তেমন আমার মোনায়েম খান

আমাদের বাসস্থান সমস্যার কথা আগেই বলেছি। আমাদের ৩০ ভাগ লোকের কোন বাসস্থান নেই বললেই চলে, আর ১০ ভাগ লোক সম্পূর্ণ খোলা আকাশের নীচে রাত কাটায়। পৌষ-মাঘ মাসের প্রচন্ড শীতেও এই শহরের ফুটপাতে কত মানুষ যে একটি চটের বস্তা গায়ে দিয়ে রাত কাটায় তা আমরা অনেকেই দেখেছি। গতবছর শীতের রাতে দেখলাম খালেদা জিয়া কম্বল নিয়ে তাদের কাছে হাজির হয়েছেন, আর সে খবর রেডিও টিভিতে ফলাও ক'রে প্রচার করা হলো। শোষক শ্রেণীর প্রভুদের ভন্ডামী আর কাকে বলে। ঢাকা শহরের চারপাশে প্রায় ২০ লক্ষ লোক বস্তিতে বসবাস করে। যাদের জীবনের দুর্ভোগ ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়। এমনকি সেখানেও তাদের থাকার নিশ্চয়তা নেই। একদিকে সব মাস্তানের শ্রেষ্ঠ মাস্তান সরকারের পুলিশ বাহিনী অন্যদিকে স্থানীয় গুন্ডা-পান্ডা টাউট-বাটপার তাদেরকে সব সময় উৎপাত করে। বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়, এমনকি গুলি চালানো হয়। তাদের থেকে নিয়মিত চাঁদা আদায় করা হয়। জোরপূর্বক তাদেরকে উৎখাত করা হয়। বস্তির চারপাশে পুলিশ দিয়ে ঘেরাও করে গুন্ডা-পান্ডা মাস্তান নিয়ে বুলডোজার লাগিয়ে বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করা হয়। এই নিরীহ মানুষগুলিকে এভাবে উঠিয়ে দিলে তারা পরিবার পরিজন নিয়ে কোথায় যাবে, কোথায় আশ্রয় পাবে, তার চিন্তা-ভাবনা করার কোন দায়-দায়িত্ব কি আমাদের আছে? এরাও এই বাংলার মাটিতেই জন্ম গ্রহণ করেছে। এরাও আমাদের দেশের নাগরিক, এরাও ভোট দেয়। খোঁজ নিলে দেখা যাবে আজ যারা বস্তিবাসী একদিন তাদের গ্রামে বাড়ীঘর জমি-জিরাত সবই ছিল, সমাজ তাদের সবকিছু গ্রাস ক'রে ভিটে মাটি ছাড়া ক'রে বস্তিতে পাঠিয়েছে। মানুষ যে কত জঘন্য

www.pathagar.com

হতে পারে, সরকারের আচরণ যে পশু আচরণকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে তা বস্তিবাসীদের উপরকার নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা হতেই বোঝা যায়। খালেদা জিয়া ফুটপাতে রাত কাটানোদের গরম কাপড় দেন। নেতারা বস্তিবাসীদের পক্ষে বিবৃতি ছাড়েন। কিন্তু তারা কি এই ফুটপাতওয়ালাদের ও বস্তিবাসীদের সবার জন্য আশু বাসস্থানের ব্যবস্থা ক'রে দেওয়ার কথা বলতে পারবেন, ওদের কর্মসংস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসার দায়দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করবে একথা কি বলতে পারবেন। খালেদা জিয়া কি এই ঘোষণা দিতে পারেন যে, আজ থেকে এদের সবার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করলাম এবং দুই বৎসরের মধ্যে সবাইকে বাড়ী ক'রে দেব। না তিনি তা পারেন না, এটা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে কেন এ ধরনের কোন সরকারের পক্ষেই এটা সম্ভব নয়। কুকুর বেড়ালের জন্মদিবস পালন করতে যাদের হাজার হাজার টাকা খরচ হয়, ছেলে মেয়েদের জন্মদিবস শেরাটন সোনারগাঁয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে যাদের করতে হয় তাদের শ্রেণীর রক্ষক প্রভুদের এ ধরনের দায়-দায়িত্ব নেয়া সম্ভব নয়। এককথায় বর্তমান সামাজিক কাঠামোয় এটা সম্ভব নয়। এখানে একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। খুব সম্ভব ১৯৬৬ সালের কথা। পুরাতন রেললাইনের পাশে নীলক্ষেত বাবুপুরায় একটি বস্তি ছিল, আমাকে একসময় ওরা ওদের বস্তির সেক্রেটারী বানিয়েছিল। একদিন রেল কর্তৃপক্ষ ২৪ ঘন্টার মধ্যে ওদেরকে উঠে যাওয়ার জন্য রেলের ট্রলিতে ক'রে এসে বলে যায়। ঐ এলাকার কিছু নেতৃবৃন্দ তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের রেলমন্ত্রী সুলতান সাহেবের বাসায় যান। তিনি তখন বিদেশে থাকায় তার মেয়ে যে তখন প্রাদেশিক পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন তাকে নিয়ে পরদিন বলাকা সিনেমা হলের দক্ষিণ পার্শ্বে যে খালি জায়গা ছিল, সেখানে বস্তিবাসীদের এক সভা করা হয়। সভায় সকল বক্তা পূর্বতন সরকারগুলির উপর বস্তি সৃষ্টি করার তীব্র অভিযোগ আনে। সভায় সবাই আয়ুব খান, মোনায়েম খানের ভূয়সী প্রশংসা করতে থাকে। একজন "যেমন আমার আয়ুব খান তেমন আমার মোনায়েম খান" বলে একটা গান গেয়ে শুনালেন। চাটুকার চিরকালই ছিল এখনও আছে আর ওদের রং বদলায় এক নিমেষে। যাহোক আমি বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলা শুরু করলাম "আগের সরকারের আমলে বস্তি সৃষ্টি হয়েছে এ কথা সত্য,তারা দায়িত্বহীন ছিল তাও সত্য। কিন্তু তা দূর করার জন্য কি কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে? ১৯৫৮ সনের আগে বস্তিতে কত লোক ছিল আর আজ তা কতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে তা কি আপনারা খতিয়ে দেখেছেন। এরা উঠে যাবে কোথায়, তা কি আপনারা বলে দিতে পারবেন"। এরপর ষ্টেজ থেকে আমার বক্তৃতা থামাবার জন্য কাপড় ধরে টানাটানি শুরু হয়ে গেল। আমার বক্তৃতার পর আরো বক্তার সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে আমি যেহেতু ছাত্র ছিলাম সেহেতু ছাত্রদের ধোলাই শুরু করা হলো। বলা হলো ছাত্রদের কথা শুনবেন না, ওরা খারাপ, ওরা কুমন্ত্রণা দেয়। আরো কত কথা। কিন্তু যেহেতু বস্তিবাসীরা আমার পক্ষে ছিল ওদের মনের কথা আমি বলেছি সেহেতু তারা

www.pathagar.com

বেশিদূর আগাতে সাহস পায়নি। এম, পি সাহেবাও তার সরকারের গুণগান ক'রে বস্তিবাসীদের উঠে যাওয়ার জন্য তিন মাস সময় দিয়ে চলে যান।

যা হোক যে কথা বলছিলাম, বর্তমান কাঠামোয় বস্তিবাসীদের পুর্নবাসন সম্ভব নয়, বাসগৃহের মাধ্যমে শহর অঞ্চলে যেখানে ব্যাপক পরিমাণে সামন্তবাদী শোষণ বিদ্যমান, বাসগৃহ করার মত সব জমি ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণে সেখানে একটা ব্যাপক পরিবর্তন ছাড়া এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ভাড়াগৃহে যারা থাকে তাদের সমস্যাও কম নয়, আবার বাড়ীওয়ালাদের সমস্যাও রয়েছে। একটা আমূল কাঠামোগত পরিবর্তন এ সমস্যা থেকে সবাইকে মুক্তি দিতে পারে। এ শহরে এমন এমন ব্যক্তি আছে যার কমপক্ষে একশত বাড়ী আছে, এরপরেও তারা নেশাখোরের মতো আরো বাড়ী করার পিছনে ছুটছে। ঢাকা শহরের যতো সামাজিক অনাচার, বিশৃঙ্খলা, গোলমাল তার বেশির ভাগই জায়গা দখল, বাড়ী দখল নিয়ে। এসব নিয়ে মারামারি পিটাপিটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এইতো আমাদের সামাজিক কাঠামো। আমরা বিশ্বাস করি, জনগণের সরকার যদি প্রতিষ্ঠা করা যায়, সমাজ ব্যবস্থা যদি পাল্টে দেয়া যায়, মালিকানার ধরন যদি একটু বদলে দেয়া যায়, সামন্তবাদী শোষণ থেকে যদি মানুষকে মুক্তি দেয়া যায় এককথায় গণশাসনের সমাজ যদি প্রতিষ্ঠা করা যায় তা'হলে মাথা গোঁজার জন্য কোন নাগরিককেই দুশ্চিন্তা করতে হবে না। বস্তিবাসীদের জন্য খুবই স্বল্পসময়ের মধ্যে এমন কি দুই বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে ছোট খাটো ফ্লাট বাসার ব্যবস্থা করা কোন সমস্যা নয়। সঠিক নীতি নির্ধারণ করতে পারলে এর জন্য অর্থ তেমন কোন সমস্যা নয়। নিজেরাই পারি এ সমস্যার সমাধান করতে। বিদেশ থেকে ভিক্ষা এনে বস্তি উন্নয়ন করার প্রয়োজন নেই।

বস্তিবাসীর মতো অপর একটি বিষয় হচ্ছে ফুটপাতে ব্যবসারত গরীব হকার্সরা, যারা ফুটপাতে ছোটখাটো জিনিস বিক্রি ক'রে তাদের পরিবার পরিজনকে অর্থাৎ এদেশের মানুষকে খাওয়ায়। তাদের অবস্থাও বস্তিবাসীর মতোই। পুলিশের চাঁদা, মাস্তানদের চাঁদা, মারপিট, উচ্ছেদ তাদের বেলায় লেগেই আছে। এদের পরিবার পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকার এই অবলম্বন যারা নষ্ট করে তারা যে কত দায়িত্বহীন, বিবেকহীন ও অমানুষ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এসব হকার্সদের দায়িত্বও রাষ্ট্রকে নিতে হবে।

এই মুহূর্তে বস্তিবাসীদের সংগঠিত করার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। বস্তিবাসীদের সবচেয়ে বড় দাবী হওয়া উচিৎ শুধু উচ্ছেদ বন্ধ ও সুযোগ সুবিধা নয়, প্রত্যেকের জন্য বাসস্থান চাই। সবাই এদেশের নাগরিক। প্রত্যেকের মাথা গোঁজার জায়গা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যদি কিছু বস্তিবাসী ও হকার্সদের সঠিকভাবে সংগঠিত ক'রে একটি সংগঠন গড়ে তোলা যায়, এবং তারা যে কোন সংগ্রামে নামতে প্রস্তুত থাকে তা'হলে পুলিশই হোক

www.pathagar.com

আর মাস্তানই হোক বস্তি থেকে এদেরকে উচ্ছেদ করতে গেলে বা হকার্সদের তাড়া করতে গেলে চিন্তা ভাবনা করতে বাধ্য হবে। জুলুম অত্যাচার চাঁদাবাজী বন্ধ হবে। গণশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাসস্থান ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সামন্তবাদী শোষণ হতে জনগণকে মুক্ত করা এবং সকল বস্তিবাসী ও গৃহহীনদের জন্য অনতিবিলম্বে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। দেশের শাসনতন্ত্রই এ দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এসব ব্যাপারে সব কিছু খোলাখুলি বলার সময় আসেনি, কাজেই এ সম্পর্কে এখানেই শেষ করছি।

(ঘ) চিকিৎসা ব্যবস্থা

অনেকে সারাজীবনে একটি প্যারাসিটামল ট্যাবলেটের মুখ দেখেনি

এবার আমি আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলব। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আজো আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবজ এবং টোট্‌কা চিকিৎসার উপর নির্ভরশীল। এমনও মানুষ আছে যে সারা জীবনে ১টি প্যারাসিটামল ট্যাবলেটের মুখ দেখেনি। মাথা পিছু চিকিৎসা খাতে সরকারের ব্যয় মাত্র ১ টাকা ৬৫ পয়সা। বস্তুত পক্ষে আমাদের দেশের ৭০ ভাগ লোক একরকম বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। আমাদের মতো সমাজে যেখানে অবাধ ব্যক্তিগত সম্পদের সুযোগ রয়েছে, অর্থ যেখানে সবকিছুর মাপকাঠি সেখানে আমাদের ডাক্তাররা স্বভাবতই চিকিৎসার ক্ষেত্রে মানবিক দিক বিবেচনা না ক'রে ব্যবসায়িক দিক বিবেচনা ক'রে থাকেন। চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অর্থের উপর নির্ভরশীল। সরকারী ডাক্তাররাও হাসপাতালে চিকিৎসা করার চেয়ে প্রাইভেট ব্যবসার দিকে বেশি আগ্রহী। আমাদের এই সমাজে যার অর্থ নেই তার পক্ষে চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ নেই বল্লেই চলে। ডাক্তার তাকে দেখেনা, দোকান ভর্তি ঔষধ থাকলেও কেউ যদি পয়সার অভাবে ঔষধ কিনতে না পেরে ঐ দোকানের সামনে মারাও যায় তা'হলেও কারো কিছু আসে যায় না। স্বাধীনতার এতো বছর পরও আমরা আমাদের জনগণের নিকট অতি সাধারণ চিকিৎসা ব্যবস্থাও পৌঁছে দিতে পারলাম না —এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি হতে পারে। আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, মানুষের প্রতি অমানবিক আচরণ আর বিনা চিকিৎসায় মানুষের মৃত্যুবরণ সবই সমাজ কাঠামোর সরাসরি ফল। আমরা এমন একটি সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বাস করি, যেখানে মরলেও আমাদের জীবনের কোন হিসাব নেই। আসলে আমরা সবাই লাওয়ারিশ। রাষ্ট্র আমাদের দিকে কোন নজর দেয় না, কোন দায়িত্ব পালনও করে না। গণশাসন প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিটি মানুষের চিকিৎসার দায়-দায়িত্ব রাষ্ট্রের নেয়া। কোরিয়ার

www.pathagar.com

শাসনতন্ত্রের ৫৮ ধারায় প্রত্যেক নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার নিশ্চয়তা দেয়া আছে। আমাদেরকেও তেমন শাসনতান্ত্রিকভাবে এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। কোরিয়ার প্রতিটি লোকের একটি ক'রে হেল্‌থ কার্ড রয়েছে। সেখানে তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সারাজীবনের চিকিৎসার রেকর্ড রক্ষা করা হয়। চিকিৎসা পাওয়া মানুষের জন্মগত অধিকার। একটি রাষ্ট্র যদি তার জনগণের নূন্যতম চিকিৎসার দায়দায়িত্ব নিতে না পারে তবে সেই রাষ্ট্রের কোন অর্থ হয় না। কোরিয়ায় প্রত্যেকটি এলাকায় নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের জন্য নির্ধারিত ডাক্তার রয়েছে এবং ডাক্তারের সংখ্যা সেখানে সবচেয়ে বেশি। বিশ্বে যেখানে প্রতি দশ হাজার লোকের জন্য ডাক্তরের সংখ্যা ৯জন, হাসপাতালে বেডের সংখ্যা ৩৮টি, এশিয়ার ডাক্তারের সংখ্যা ৪ জন, বেডের সংখ্যা ২০টি সেখানে কোরিয়ায় ডাক্তারের সংখ্যা ২৭ জন এবং বেডের সংখ্যা ১৩১ টি। আর আমাদের অবস্থা উল্লেখ করতে লজ্জা হয়। আমরা কি চেষ্টা করলে অত্যাধুনিক না হোক, সবার জন্য অন্তত সাধারণ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারতাম না। আমাদের সদিচ্ছা থাকলে মোটামুটি কিছু ট্রেনিং ও শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে অনেক সংখ্যক ডাক্তার তৈরি করতে পারি এবং সাধারণ চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ঔষধ নিজেরাই উৎপাদন করতে পারি। আমরা অতি সাধারণ ঔষধের জন্য একদিকে বিদেশের উপর, অন্যদিকে বহুজাতিকের কারখানার উপর নির্ভরশীল। গণশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কেউ যেন বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ না করে এবং তা করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

(ঙ) শিক্ষা ব্যবস্থা

লেখাপড়ার বিলাসিতা ওদের মানায় না

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে দু'টো কথা বলা প্রয়োজন। বৃটিশ আমলে তাদের তাবেদার কেরানী গোষ্ঠী তৈরি করার লক্ষ্যে এ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়েছিল, যাতে এরা মনে প্রাণে ও মগজে বৃটিশের সেবাদাস হয়। এ শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদেরকে কতটুকু মানুষ করেছে, সমাজের প্রতি আমরা শিক্ষিতেরা কতটুকু দায়িত্ব পালন করি তা একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যায়। উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজের কতটুকু উপকারে আসে তা'ও ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে।

এরপরও বলতে হয় বিগত ৪০ বৎসর ধরে আমাদের শিক্ষিতের হার শতকরা ২০/২২ ভাগেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ ক'রে কিছু ভবন নির্মাণ ছাড়া শিক্ষিতের হার বাড়েনি। এর কারণ কি? শিক্ষার সঙ্গে আমাদের ভূমি ব্যবস্থার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। শতকরা ৭০ জন ভূমিহীন কৃষকের ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠানো তাদের জন্য বিলাসিতার সামিল। তারা

www.pathagar.com

যদি তাদের ছেলেমেয়েকে স্কুলে না পাঠিয়ে অন্যের বাড়ীতে চাকর হিসেবে কাজ করতে নিয়োগ করে বা অন্য কোন কাজে লাগায় তা'হলে একদিকে যেমন এসব ছেলেমেয়েদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার খরচ হতে তারা অব্যাহতি পায়, অন্যদিকে এভাবে ছেলেমেয়েরা কাজ করায় তাদের কিছু বাড়তি আয়ও হয়। এরই ফলে শত চেষ্টা ক'রেও এমনকি সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলেও কোন কাজ হয়নি। যার পেটে ভাত নেই পরনে কাপড় নেই সে তার ছেলেমেয়েকে কোন শখে স্কুলে পাঠাবে। আমাদের সমাজে বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলা একটি অন্তঃসারশূন্য কথা। এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য দেখা যায় প্রথম দিকে স্কুলে ভর্তি হলেও অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী দু'এক বৎসরের মধ্যেই স্কুল ত্যাগ করে। মেয়েদের ব্যাপারে আবার সামাজিক সমস্যাও রয়েছে। আমরা যেমন একদিকে দ্রুত অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তন করতে বদ্ধপরিকর, অন্যদিকে অতি দ্রুত দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ছোট বড় সবাইকে শিক্ষার আওতায় আনতে হবে। প্রয়োজনবোধে ইউনিভার্সিটি কলেজ কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রেখে ছাত্রদের নিজ নিজ গ্রামে পাঠিয়ে অশিক্ষিতদের সবাইকে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। কৃষক-শ্রমিকদের সুবিধামত সময়ে তাদের বাড়ীতে গিয়ে লেখাপড়া শিখাতে হবে। কলকারখানা কর্মস্থল সর্বত্র লেখাপড়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি একটু সচেষ্ট হলে এবং সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ করলে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে দুই বৎসরের বেশি সময় লাগবে না। সঠিক কর্মসূচী ও পরিকল্পনাই বড় কথা। অর্থ অবশ্যই বড় সমস্যা নয়। অর্থ বিনিয়োগ ক'রে যদি শিক্ষিতের হার বাড়ানো যেত তা'হলে এ পর্যন্ত যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তাতে শিক্ষিতের হার অনেক বেশি বৃদ্ধি পেত। কোরিয়ার স্বাধীনতার সময় শিক্ষিতের হার আমাদের চেয়ে অনেক কম ছিল। ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল লোককে শিক্ষিত করার কর্মসূচী গ্রহণ করার ফলে অতি অল্পসময়ে তারা দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে সক্ষম হয়। সে দেশের শাসনতন্ত্রের ৪৩ ও ৫৯ ধারা মোতাবেক প্রত্যেকের শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে। শিক্ষাকে বড়লোকের একচেটিয়া অধিকার হিসেবে না রেখে সবার অধিকার হিসেবে তা প্রতিষ্ঠা করতে আমরা বদ্ধপরিকর। আসলে শিক্ষার হার বৃদ্ধি করতে শোষক শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইচ্ছুক নয় বলেই আমাদের এই অবস্থা। শাসক গোষ্ঠীরা ভয় পায় আমাদের সাধারণ মানুষ শিক্ষিত হয়ে গেলে ওদের শোষণ লুটতরাজ বন্ধ হয়ে যাবে। এ অবস্থা আর আমরা চলতে দিতে পারি না। শাসনতান্ত্রিক ভাবে শিক্ষার অধিকারকে আমরা নিশ্চিত করতে চাই। একই সঙ্গে শিক্ষার গুণগত মান পরিবর্তন ক'রে শিক্ষিতরা যাতে মানুষ হয় তাও আমরা দেখতে চাই।

www.pathagar.com

(১০) পররাষ্ট্রনীতি ও দেশরক্ষা ব্যবস্থা

গরীবের বউ সবার ভাবী

আজ পর্যন্ত আমাদের যতগুলি সরকার ক্ষমতায় গিয়েছে প্রত্যেকেই নতজানু পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। আসলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল সাম্রাজ্যবাদী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এবং দেশরক্ষায় অক্ষম জাতির পররাষ্ট্রনীতি এরকমই হতে বাধ্য। সবাই এদের উপর খবরদারী চালায়। এটা সেই প্রবাদের মতো "গরীবের বউ সবার ভাবী"। আমাদের কোন সরকারের পক্ষেই ভারতকে তোয়াক্কা না ক'রে চলা সম্ভব নয়। ক্ষমতায় যাওয়ার আগে ভারতের শাসকগোষ্ঠী সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গিই থাকুক না কেন ক্ষমতায় যাওয়ার পর প্রত্যেকেই দিল্লির সনদের জন্য অস্থির হয়ে উঠে। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে দিল্লির সনদ না পেলে কেউই রাষ্ট্র চালাতে পারেনা। এটা আসলে আমাদের পুরানো ট্রেডিশন যা আমরা এখনো ভুলতে পারিনি। সিরাজদ্দৌলা বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন আমরা জানি। কিন্তু তখনও দিল্লির সনদ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। সিরাজদ্দৌলাকে দিল্লির সনদ দেয়া হয়নি। সনদ দেয়া হয়েছিল শওকত জংকে। আর তাই ইংরেজদের ক্ষমতা দখলে দিল্লি বিরোধিতা করেনি। অন্যদিকে কিছুদিন পরেই দিল্লি ইংরেজদেরকে বাংলার দেওয়ানী প্রদান ক'রে আইনগত স্বীকৃতি দেয়। যার জন্য ক্লাইভ বলেছিল "দেওয়ানী পেয়ে আমি খুব খুশী"। যা হোক, সে সনদ গ্রহণের ট্রেডিশন এখনও যেন অপ্রকাশ্যে চালু রয়েছে। আবার সে সনদ গ্রহণের প্রতিযোগিতায় বড় বড় বিরোধী দলগুলিও প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। এই যখন অবস্থা তখন ফারাক্কা, ছিটমহল, তালপট্টি, চাকমা, সকল নদীর উজানে বাঁধ নির্মাণ, পুশইন ইত্যাদি দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা নিয়ে সমতার ভিত্তিতে কথা বলার অবকাশ কোথায়।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলির সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হওয়ার ফলে তাদের নির্দেশ অমান্য করা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক মোড়লীপানা, এমনকি কোন কোন রাষ্ট্রের উপর তার আগ্রাসনের সময়েও আমাদের সরকারকে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করতে হয়, আর না হয় বলতে হয় আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। কোরিয়ার পারমানবিক স্থাপনা পরিদর্শনের নামে আমেরিকা যা করছে কোরিয়ার অনুরোধের পরও আমাদের সরকার সে ব্যাপারে মুখ খুলতে সাহস পায়নি। নিজেরা দুর্বল বলে পাকিস্তানের কাছে হিসাবও চাইতে পারিনি। বিহারীদের ফেরৎ নেওয়ার কথা জোর ক'রে বলতে পারি না। ভারত বিভাগের সময় কলকাতার উপর দাবী ছেড়ে দেয়ায় আমাদেরকে সে সময় ৩৩ কোটি

www.pathagar.com

টাকা দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা কোন দিনই দাবী করতে পারিনি। আমাদের সব পাওনাই একে একে তামাদি হয়ে গিয়েছে।

আমরা যদি স্বাধীন স্বর্নির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে না পারি, দেশরক্ষায় সমর্থ না হই এবং জনগণের অবস্থা পরিবর্তন ক'রে তাদেরকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে না পারি তাহলে এমন অবস্থাই চলতে থাকবে— ক্ষমতায় যেই যাক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ে তোলার কারণে ও জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে সক্ষম হওয়ায় এবং শক্তিশালী দেশ গড়ে তোলায় কোরিয়া আজ অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা ক'রে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে। সেখানে প্রতিটি কর্মক্ষম লোক সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত। আমাদেরকেও এমনিভাবে স্বাধীন স্বনির্ভর অর্থনীতি এবং জনকল্যাণমুখি অর্থনীতি গড়ে তোলার পাশাপাশি সমস্ত কর্মক্ষম ব্যক্তিদের সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তুলতে হবে এবং দেশরক্ষার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। এজন্য প্রাথমিকভাবে দুই বৎসরের বেশি সময় নেয়া যাবে না। দরকার হলে সেনাবাহিনীকে গ্রামে-গঞ্জে পাঠিয়ে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সবাইকে আর্মস্ ট্রেনিং প্রদান করতে হবে। যাতে সকল জনগণ দেশরক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি বর্তমান সেনাবাহিনীর শক্তি কয়েকগুণ বৃদ্ধি ক'রেও প্রয়োজনের সময় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়। আমরা স্বাধীন স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে ও আত্মরক্ষায় সক্ষম হতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সবার ভাবী আর থাকতে চাইনা।

www.pathagar.com

(১১) নারী সমাজ

শত শত বৎসর মেয়েদেরকে আমরা জীবন্ত দাহ করেছি

আমাদের জনগণের অর্ধেক নারী। সমাজ তাদেরকে নারী করেই রেখেছে, মানুষ করতে চায় না। গরুছাগলের যে মূল্য আমরা দিয়ে থাকি নারীকে ততটুকুও মর্যাদা আমরা দেই না। একটি পোষাজীবের জন্য যতটুকু মায়া থাকে, অনেক ক্ষেত্রেই তাদের প্রতি ততটুকু মায়াও থাকে না আমাদের। তিন কথায় তাদের বিদায় দিয়ে থাকি। প্রাচীন যুগের একজন নামকরা ভাববাদী দার্শনিক বলেছিলেন দাস এবং নারীদের আত্মা নেই। সে শিক্ষা আমরা যেন আজো ভুলিনি। আমাদের সমাজে মেয়েরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। তারা দ্বৈত শোষণের শিকার। একদিকে সামাজিক শাসন, শোষণ ও নিপীড়ন, অন্যদিকে পুরুষ শাসন ও নির্যাতন। শিশুকালে তারা পিতার, বয়সকালে স্বামীর, শেষ বয়সে পুত্রের গলগ্রহ হয়ে না হয় ভিক্ষা ক'রে জীবন কাটায়। উত্তরাধিকার, বিয়ে, তালাক, সন্তান লালন-পালন, পরিচয় ও চাকুরী বাকুরীর ক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে আইন-কানুন ও প্রথাসমূহ একপেশে। মুখে সমঅধিকার ও নারী মুক্তির কথা বললেও এই সমস্ত অসম আইন-কানুন উঠিয়ে দেয়ার কথা বলার সাহস কেউ করে না। দৈনন্দিন জীবনে মেয়েদেরকে আমরা খাবারও কম দিয়ে থাকি। আমাদের সমাজে পুরুষ মানুষ যেখানে গড়ে ১৮০০-২২০০ ক্যালরি গ্রহণ ক'রে থাকে সেখানে মেয়েরা পায় ১২০০-১৩০০ ক্যালরি। গ্রাম অঞ্চলে নানাবিধ কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ ক'রে তাদেরকে অর্ধমৃত ক'রে রাখা হয়েছে। এমনকি ফতোয়া জারী করে আজকের এ যুগেও পাথর ছুড়ে বা আগুনে পুড়িয়ে মারার মতো ঘটনা আমরা দেখতে পাই। সতীদাহর নামে শত শত বৎসর আমরা তাদেরকে জীবন্ত দাহ করেছি। অধিকাংশ মেয়ে মানুষই অনুৎপাদক বর্বর শ্রমের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এমনকি কর্মক্ষেত্রেও দেখতে পাই, ইটভাঙ্গা মাটিকাটাই হোক আর গার্মেন্টস্‌ই হোক আর বেসরকারী অফিসেই হোক না কেন তাদের আয়ের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম। এসব আসলে সামাজিক কাঠামোর ফল। পুরুষ সৃষ্ট সামাজিক কাঠামোই এই অবস্থা সৃষ্টি করেছে। সম্পদের উপর পুরুষের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে তাদের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশায় নিপতিত হতে হয়। দাস সমাজ তাদেরকে মানুষের বাইরে নিয়ে যায়। সামন্তবাদী সমাজ তাদেরকে ভোগ্যবস্তুতে পরিণত করে। আর পুঁজিবাদী সমাজ তাদেরকে পণ্যে রূপান্তরিত করে। বহু বৎসরের শাসন শোষণ নির্যাতন বিশেষ ক'রে সামাজিক নিয়ম-কানুন ও ধর্মীয় বিধি নিষেধ তাদেরকে এমন মানসিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে যে তারা যে মানুষ তা তারা নিজেরাও ভুলে গেছে। তারা তা চিন্তা করতেও চায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই নিজেদের মুক্তির

www.pathagar.com

পথে বড় বাঁধা। তাদের সার্বিক মুক্তির কথা কেউ বললে নানা কুসংস্কারের দোহাই দিয়ে নিজেরাই তার বিরোধিতা করে। আমি দেখেছি পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই এমনকি তথাকথিত এই শিক্ষিত মেয়েরাও নারী মুক্তির বিপ্লবী কথাবার্তা যারা বলে তাদেরকে বেশি বিরোধিতা করে। ওদের অবস্থা খাঁচার পাখির মত। খাঁচা খুলে দিলেও উড়তে সাহস করে না। আবার মেয়েদেরকে মানসিকভাবে পঙ্গু ক'রে মেয়েরাই গড়ে তুলে। মা-খালা, দাদী-নানীরা মেয়েদেরকে শিশুকাল হতে এমন শিক্ষা দেয়, যাতে বড় হয়ে ওরা আর নিজেদেরকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে চিন্তা করতে পারে না। অবশ্য পুরুষ সৃষ্ট সামাজিক অবস্থার কারণেই এসব হয়ে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি আমাদের মেয়েরা যতটুকু অধিকার পেয়েছে তার পিছনে তাদের নিজস্ব অবদান তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এসব ক্ষেত্রে পুরুষদের সচেতন অবদান অনেক বেশি। তবে এও বলা হয়ে থাকে যে, পুরুষ নিজ স্বার্থে ঠেকেই তাদেরকে এসব অধিকার দিয়েছে। অন্যদিকে আবার অনেকে প্রাপ্ত সুযোগে এমন বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দেয় ও ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি করে যে পুরুষদের শঙ্কিত না হয়ে উপায় থাকে না। এটাও ওদের এক ধরনের মানসিক পশ্চাতপদতা।

মেয়েদের স্বাধীনতার পক্ষে কিছু আইন সৃষ্টি হলেও তা বাস্তবে কার্যকরী হয়নি। আসলে যতদিন মেয়েদেরকে উৎপাদনমুখি কর্মের সাথে সম্পৃক্ত করা না যাবে, স্বাবলম্বী না করা যাবে, শ্রমের প্রকৃত মূল্য যতদিন নির্ধারিত না হবে, সম্পদের উপর তাদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা না হবে এবং তার সঙ্গে সামাজিক ও ধর্মীয় বিভেদমূলক চেতনা থেকে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা না করা যাবে অর্থাৎ আদর্শগতভাবে তাদেরকে জাগরিত করা না যাবে ততদিন তাদের মুক্তির পথ নিশ্চিত করা যাবে না। সমাজের শৃঙ্খল শুধু সমাজেই নয় আমাদের নিজেদের মধ্যেও নিহীত থাকে অর্থাৎ আমরা নিজেরাই নিজেদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এ কথা যেমন সাধারণ শোষিত মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনিভাবে মেয়েদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এরজন্য প্রয়োজন সচেতনভাবে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন সাধন করা। গণশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা সে কাজটি করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যেখানে মেয়েরা সামাজিক শোষণ ও পুরুষ শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে পুরুষের পাশাপাশি সমভাবে সমঅধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করার এবং দেশ গড়ার কাজে অংশ নিবে। মনে রাখবেন দৈহিক আকৃতি দিয়ে নয় মগজের পরিমাণ ও উৎকর্ষতা দিয়েই সমস্ত জীব সমাজের অবস্থান নির্ণীত হয়। বিরাটাকায় হাতির মগজ মানুষের চেয়ে কম বলে মানুষ তার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে বা মানুষ তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ জীব। কিন্তু পুরুষ ও মেয়ে মানুষের মগজের পরিমাণ ও উৎকর্ষতার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সামাজিক কারণে ওরা বঞ্চিতা, নির্যাতিতা ও অধিকারহীনা। তবে তা চিরকালই ছিল না। সমাজে

www.pathagar.com

তারা দুইবার শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিল। আর ইতিহাসের চাকা সিঁড়ির প্যাঁচের মতো ঘুরে চলে। অতএব সাধু সাবধান।

(ক) পতিতা

কেউ না কেউ অবশ্যই আপনার আমার আত্মীয়া

আমাদের সমাজের মেয়েদের একটি বড় অংশ নিষিদ্ধ পল্লীর অন্ধগলিতে পতিতা হিসাবে জীবন কাটায়। এ যে কত বড় নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা, এ যে সমাজের কত বড় ক্ষত তা চিন্তাও করা যায় না। দাস যুগে মেয়েদেরকে যখন সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় তখন ভোগ্যবস্তু হিসাবে এ প্রথার উদ্ভব ঘটে। সামন্তবাদী সমাজে এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। আর পুঁজিবাদী সমাজ তা সযত্নে লালন পালন করে। এ সবগুলি সমাজই পুরুষ নিয়ন্ত্রিত, ফলে ওদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। আমাদের পতিতালয়গুলি হচ্ছে সমাজের সকল প্রকার পাপের এক বড় কেন্দ্রস্থল। মদ, গাঁজা, হিরোইন ও নেশাখোরদের আড্ডাখানা, চোর ডাকাত খুনী জোয়ারীদের আড্ডাখানা। মানুষ যে মানুষের উপর কত অমানবিক ও পশুর মতো আচরণ করতে পারে তা পতিতালয়গুলি রক্ষা ক'রে আমরা প্রমাণ করছি। এরজন্য সমাজ পরিচালনায় আমরা যারা নিয়ত আছি তারা সবাই দায়ী। আমরা যারা সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত তারা যেহেতু ওদেরকে পুনর্বাসন করার ব্যবস্থা নিচ্ছি না সেহেতু ওখানে না গিয়েও ওখানকার প্রতিনিয়ত পাপের অংশীদার আমরা প্রত্যেকেই হচ্ছি। যত ধর্মকর্ম আমরা করি না কেন আমাদের অজ্ঞাতে ওখানকার পাপ আমাদের ভাগে জমা হচ্ছে। কারণ আমরা সমাজপতিরা এটা টিকিয়ে রেখেছি। আর ওখানে যারা আছে তারা আমাদেরই বোন আমাদেরই মেয়ে। বিদেশ থেকে কেউ ওখানে আসেনি। বরঞ্চ আমাদের দেশের মেয়েরাই ভারত, পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্য সহ অনেক দেশের পতিতালয়ে রয়েছে। ছোট্ট দেশ বাংলাদেশ, এখানে ঘুরে ফিরে সবাই সবার আত্মীয়-স্বজন। এভাবে খুঁজলে দেখা যাবে ওরা আমাদের সবারই কোন না কোন ভাবে আত্মীয়া-আপনজন । অনেকেই পতিতালয় রাখার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলে এগুলি আমাদের সমাজের 'সেফটি বাল্ব'। আমাদের বোন বা মেয়েকে সারা জীবন নিষিদ্ধ গলির অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রেখে তিলে তিলে অমানবিকভাবে হত্যা ক'রে যারা বলে ওরা আমাদের সমাজের 'সেফটি বাল্ব' তাদের কাছে আমার একটি জিজ্ঞাসা—আমাদের বোন বা মেয়ে এই সমাজ রক্ষায় যদি সারা জীবন 'সেফটি বাল্ব' হিসাবে কাজ করতে পারে তবে তারা কি পারবেন তাদের ঘরের বোন বা মেয়েকে একদিনের জন্য সমাজের 'সেফটি বাল্ব' হিসাবে ব্যবহৃত হতে দিতে। সমাজ আমাদের প্রত্যেকেরই। কাজেই প্রত্যেকেরই সমাজ রক্ষায় কম ক'রে হলেও কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করা উচিৎ নয় কি? ওদেরকে আমরা মাঝে মধ্যে জোর করে উঠিয়ে দিয়ে থাকি, ওদের ঘর-দুয়ার

www.pathagar.com

ভেঙ্গে দিয়ে থাকি। সবই ধর্মের দোহাই দিয়ে, পাপ পুণ্যের দোহাই দিয়ে। কিন্তু ওদের পুনর্বাসনের কথা বলতে আমরা নারাজ। আসলে এসবই শোষণমূলক সমাজ কাঠামোর ফসল। নইলে ওদের পুনর্বাসন অথনৈতিক দিক দিয়ে এমন কোন সমস্যার ব্যাপার নয়। এক বৎসরের কিছু পুণ্যের টাকা এখাতে খরচ ক'রে আমরা ওদেরকে পুনর্বাসন করলে অনেক বেশি গুণ পুণ্য অর্জন করতে পারতাম। উত্তর কোরিয়ায় একটিও পতিতালয় নেই। হাজার ডলার খরচ করলেও আপনার রাতের সঙ্গী হওয়ার কেউ নেই। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক জীবনের নিশ্চয়তা আসায় মানুষের নৈতিকতাবোধেরও বিরাট উন্নতি ঘটেছে সেখানে এবং এ 'সেফ্‌টি বাল্ব' ছাড়া সমাজ সেখানে ঠিকই চলছে।

(খ) চাকরানী/গৃহভৃত্য

পাড়ার মেয়েদের চেয়েও ওদের অবস্থা খারাপ

আমাদের মেয়েদের আর একটি অংশ (অবশ্য সেখানে পুরুষও রয়েছে কিছু) চাকরানী হিসাবে মানুষের বাড়ী কাজ করে। ওদের কোন স্বাধীনতা নেই, সংগঠন নেই, কাজের কোন সময়সীমা নেই— ১৬ থেকে ১৮ ঘন্টা ডিউটি করতে হয়। শোবার বিছানা ও জায়গা নেই বল্লেই চলে। পারিবারিক কোন জীবন নেই ওদের। জীবনের কোন চাহিদাই ওদের পূর্ণ হয় না। এক্ষেত্রে পাড়ার মেয়েদের চেয়ে ওদের অবস্থা আরো বেশি খারাপ। এটা দাস সমাজের অবশেষ। আর এদের সঙ্গে আমাদের আচরণও দাস মালিক সুলভ। ওদেরকে নির্যাতন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আমরা খুব কম মানুষ ওদের সঙ্গে মানুষের মত আচরণ করে থাকি। ওদের মুক্তির ব্যবস্থা ক'রে আমরা যে মানুষ তা প্রমাণ করতে হবে।

ভিক্ষুক—যাকাত ফিৎরা দিয়ে আমরা পুণ্য অর্জন করি

আমাদের সমাজের একটি বিরাট অংশ ভিক্ষাবৃত্তিতে জীবন যাপন করে। ওদেরকে ভিক্ষা ও যাকাত ফিৎরা দিয়ে আমরা পুণ্য অর্জন করি। এই পুণ্যের যাতে ঘাটতি না হয় সেজন্য ওদের পুনর্বাসনের কথা আমরা চিন্তাও করি না। একদিন ওদের সবারই কিন্তু ঘর বাড়ী ও জমি জমা ছিল। সমাজই ওদেরকে ভিক্ষুক বানিয়েছে। ওদের কেউ না কেউ কোন না কোন ভাবে যে আমার আত্মীয় তা বলে আমি আমার প্রেষ্টিজ নষ্ট করব না। খোঁজ নিয়ে দেখেন গিয়ে ওরা কারা। শরীরের এক অঙ্গে পচন ধরলে শরীর ঠিক থাকে না। এদেরকে পুনর্বাসন করা আমাদের নিজেদের ও সমাজের স্বার্থেই প্রয়োজন।

www.pathagar.com

(১২) জাতীয় সত্তা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠা করা

আমরা সবাই রাজাকারের সহযোগী

আমাদের সব আছে। কিন্তু কি যেন নেই। জাতি হিসাবে আমরা বেশ প্রাচীন। একটি প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক-বাহক, সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারক-বাহক আমরা। অনন্য এক একক জাতি সত্তার অধিকারী আমরা। বিপুল সম্পদের অধিকারী আমরা। কিন্তু এরপরও আমাদের যা নেই তা হচ্ছে আমাদের জাতি সম্পর্কে ও সংগ্রামী ঐতিহ্য সম্পর্কে চেতনাবোধ ও আত্মসম্মান বোধ। আমাদের জাতি সম্পর্কে ও সংগ্রামী ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্ববোধ থাকতে হবে। জাতীয় আত্মসম্মান বোধের অর্থ হচ্ছে নিজের দেশ ও জাতি সম্পর্কে নিজের গর্বিত থাকা, আমরা অপরের থেকে হীন নই এই আত্মবিশ্বাস থাকা। যে জাতির গভীর আত্মসম্মান বোধ আছে এবং নিজস্ব সংগ্রামী ঐতিহ্যের উপর আস্থা রয়েছে সে জাতিকে কেউ পদদলিত করতে পারে না। আমাদের মতো জাতি অতীতে যারা সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ ছিল এবং এখনও তাদের দ্বারা নিপীড়িত হচ্ছে তাদের মধ্যে নিজেকে ছোট ক'রে দেখা ও পরাশ্রয়ীবাদ তথা বৈদেশিক আনুগত্যবাদ ও লেজুড়বৃত্তি গভীরভাবে শিকড় গেড়ে আছে এবং জাতীয় আত্মসম্মান বোধ সৃষ্টির জন্য তা দূর করতে ব্যাপকভাবে সচেষ্ট হতে হবে, বিশেষ করে যেখানে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলি অপরের কোলে মাথা গুঁজে রয়েছে।

জাতীয় স্বাধীন চেতনাবোধ সৃষ্টি করতে জাতীয় সংস্কৃতিকে উন্নত করতে হবে। আমাদেরকে আমাদের জাতীয় সত্তা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন শুরু করতে হয়েছে। এই সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার। যে জাতি তার ৩০ লক্ষ প্রাণের আত্মাহুতি ও ২ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তাদেরকে এত বছর পর আবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নামতে হয়, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের হাতে তাদেরকে নিগৃহীত হতে হয় এ যে কত বড় কলঙ্ক ও দুঃখজনক তা বলার অবকাশ নেই। স্বীয় ক্ষমতার স্বার্থে সবকিছু বলি দিয়ে সরকারও ওদেরকে লালন পালন ক'রে যাচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের লোকদের পুলিশের লাঠিপেটা করছে। এরচেয়ে আর দুঃখের কি থাকতে পারে। কিছুকাল আগে এ ধরনের একটি সমাবেশে পুলিশী হামলায় সরতে গিয়ে আমার দু'পা ভেঙ্গে দুই মাসের উপর বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছিল। মূল প্রশ্ন হচ্ছে কেন এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো? কেন আমাদের তরুণ সমাজের একটি অংশ বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ পায়? স্বাধীনতা বিরোধীদের সাথে তারা

www.pathagar.com

কেন হাত মেলায়? কেন আমাদের জনগণ গর্জে উঠতে পারে না? এর জন্য আমরা কতটুকু দায়ী? এর পিছনে আমাদের ব্যর্থতা কি? কোরিয়ায় যখন গেলাম, আমাকে কাউকে বলে দিতে হয়নি যে, এ জাতি মুক্তিযুদ্ধ করেছিল, এ জাতি জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। দেশের সর্বত্র অসংখ্য মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন সংরক্ষণ করা হয়েছে। হাজার হাজার শ্লোগান লেখা আছে সর্বত্র সারাদেশে। অসংখ্য মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ ও ভাস্কর্য সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের যে সম্মান দেয়া হয়েছে তা আমাদের কাছে অকল্পনীয়। গভীর জঙ্গলে যেখানে মুক্তিযোদ্ধারা এমনকি একরাতও কাটিয়েছিল সে জায়গাও সংরক্ষণ করা হয়েছে আরম্বরের সাথে। জায়গাটি একটি দর্শনীয় স্থান হয়ে উঠেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের ফেলে যাওয়া আধাপোড়া কাঠের অংশ, ছেঁড়া কাপড় জুতা সব কিছুই সেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা কবে কোন পথে মার্চ করেছিল তা বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেখানেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে সে জায়গায় যুদ্ধের সব স্মৃতি ভাস্কর্য ও চিত্রের মাধ্যমে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধের উপর মিউজিয়াম তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া বিশাল বিশাল বিজয় স্তম্ভ, বিজয় তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে। তাদের স্কুল কলেজে লেখাপড়ায় এবং নিয়মিত পত্রপত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধের বীরত্ব গাঁথার কথা পড়ান হয় ও প্রকাশিত হয়। এর ফলে দেশের মানুষ সবকিছু জানতে পারে। জানতে পারে তাদের সংগ্রামের কথা, জানতে পারে হানাদারদের অমানুষিক নির্যাতনের কথা, জানতে পারে তাদের বিজয়ের কথা, জানতে পারে অতীতের কথা, গর্বের কথা। এগুলো জেনে জেনে ওদের বুক গর্বে ফুলে উঠে। মানসিকভাবে ওরা গড়ে উঠে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে। যে কোন চেতনার বিষয় মানসিক ব্যাপার। জোর ক'রে তা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। মানুষের স্মৃতি সময়ের সাথে সাথে ম্লান হয়ে যেতে থাকে। স্মৃতিতে জাগরূক না রাখতে পারলে তা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাই হোক আর জাতীয় সত্তার চেতনাই হোক, ধীরে ধীরে মুছে যাবে। অথচ আমাকে নিজেকে চিনতে আমার জন্য সে সব চেতনা অপরিহার্য। আর নিজেকে যদি আমি না চিনতে পারি তা'হলে আমার ভবিষ্যত কি দিয়ে গড়ব। আমার দেশে কি মুক্তিযুদ্ধের এসব চিহ্ন পাওয়া যায়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নিজেদেরকে শানিত করতে বা নতুন প্রজন্মকে এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে আমরা কি কিছু করেছি। বলতে গেলে একরকম কিছুই করিনি। হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অনেক জায়গায়ই আমরা অনেকেই অংশগ্রহণ করেছিলাম। পরবর্তীকালে অনেক জায়গায়ই ঘুরে দেখেছি সে সব স্থানের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কোথায় যুদ্ধ হয়েছিল, কোথায় কারা ছিল তার নিশানা বের করা সত্যিই কষ্টকর, ভাস্কর্য বা চিত্রতো দূরের কথা। সব স্মৃতি যেন মুছে গেছে। অথচ কিছুটা চিহ্ন রক্ষা করতে পারলে ঐ অঞ্চলের আজকের তরুণরা জানতে পারত আমাদের সংগ্রামের কথা, প্রবীণরা পারত তাদের স্মৃতিকে শাণিত করতে। একটা শহীদ মিনার সারা দেশে

www.pathagar.com

ছড়িয়ে থেকে আমাদের চেতনায় অন্তত ফেব্রুয়ারী মাসে হলেও গভীরভাবে নাড়া দেয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যা হাজার গুণ বেশি নাড়া দিতে পারত তা আমাদেরকে সেভাবে প্রভাবিত করলে আজকে আবার নতুন ক'রে তা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নামতে হতো না। এই নিয়ে নিজেদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হতো না, পরাজিতরা মাথাচাঁড়া দিতে পারত না। আজ পর্যন্ত আমরা পারলাম না একটি বিজয় তোরণ নির্মাণ করতে, পারলাম না একটি বিজয় স্তম্ভ তৈরি করতে। স্বাধীনতার স্থপতির একটি বড় প্রতিকৃতি স্থাপন করলাম না। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ও সেক্টর কমান্ডারদের প্রতিকৃতি তৈরি ক'রে তাদেরকে জনগণের সামনে তুলে ধরে রাখতে পারলাম না। প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধাদের আমরাই ভুলতে বসেছি। নতুন প্রজন্ম আর কি করবে? এই সমস্ত জাতীয় বীরদের জন্য কি কিছুই করার নেই। তবে একটি কথা দুর্গার পার্শ্বে কিন্তু অসুরকেও রাখতে হয়। কোরিয়ায় শুধু মুক্তিযুদ্ধের উপর একটি মিউজিয়াম তৈরি করা হয়েছে। সে মিউজিয়ামের সংগ্রহ বিন্যাস ও উপস্থাপনা এমন যে ওখানে যে যাবে সেই আবেগ প্রবণ হয়ে উঠবে। মুক্তিযুদ্ধের ফিল্ম, ছবি ও নেতার বক্তব্য ও কর্মকান্ডও সেখানে নিয়মিত দেখান হচ্ছে। আমরা কি মুক্তিযুদ্ধ ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের উপর দুইটি পৃথক মিউজিয়াম তৈরি করতে পারি না। কোরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্যকারী নিহত রাশিয়ান সৈন্যদের জন্য স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য করার পিছনে ভারতীয় শাসকবর্গের বিরাট স্বার্থ ও উদ্দেশ্য ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণ সৈন্য যারা জীবন দিয়েছে তারাতো এখানে কোন রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করতে আসেনি। ওদের জন্য একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করলে আমরা কি ছোট হয়ে যাই? শেখ মুজিবের ৭ই মার্চ এর ভাষণ যা একটি ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়েছিল তা রেডিও, টেলিভিশনে দিতে গেলে আমাদের গা জ্বালা করে। শেখ মুজিব নামে কেউ ছিল তা প্রাণপণে ভোলার চেষ্টা করছি। শেখ মুজিবকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশ মানে Hamlet without Prince of Denmark. তাকে বাদ দিয়ে কি বাংলাদেশ হয়। তাকে বাদ দিলে আমরা কোথায় থাকি? আবার জিয়াউর রহমান যিনি শেখ মুজিবের নাম ব্যবহার ক'রে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাকে আমরা রেডিওর ঘোষক বানিয়ে ছাড়ি। ওরা বোঝে না যে এদেরকে ছোট করলে আমরা নিজেরাই ছোট হয়ে যাই। সিরাজদ্দৌলাকে এভাবে ছোট করার প্রবণতা ছিল বহুদিন। এতে আমাদের লোকসান ছাড়া লাভ হয়নি। পরে বুঝতে পেরে গিরীস চন্দ্র তাকে বীর হিসাবে চিহ্নিত করেন, ততদিনে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। মওলানা ভাসানীর নামগন্ধ মুছেই ফেলেছি আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস থেকে। অথচ স্বাধীনতার স্বপ্নতো তিনিই প্রথম দেখিয়েছিলেন আমাদেরকে। আসলে আমরা কেউই নিজস্ব সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে পারছি না। একটু উদার হতে আমাদের বড় কষ্ট। অবশ্য এর পিছনে কারণও রয়েছে। এদেরকে দলীয়করণ ক'রে রাখা হয়েছে। দলের

www.pathagar.com

নাগপাশ হতে এদেরকে উদ্ধার করা যাচ্ছে না। জাতীয় স্বার্থে এদেরকে আমাদের বড় প্রয়োজন। আর সে স্বার্থে এ দলগুলির ক্ষয় কাম্য। যা বলছিলাম, যে সমস্ত জায়গায় মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল তার একটিও আমরা সংরক্ষণ করিনি। এসব করার ইচ্ছা থাকলে অর্থ তেমন কোন বড় সমস্যা ছিল না, উদ্যোগই বড় কথা। সারাদেশে শহীদ মিনার সরকারকে করতে হয়নি। স্থানীয় নিজস্ব উদ্যোগেই তৈরি হয়েছে। এসব কোন কিছুই না করে নিজেরা রাজাকারের সহযোগী হিসাবে কাজ করব আর মুখে ''মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা" বলব তা হতে পারে না। চেতনা আকাশ হতে পড়ে না, চেতনা প্রতিষ্ঠার বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হয়। আজকে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু স্মৃতিচিহ্ন এবং লেখালেখি আছে বলেই এখনও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে আন্দোলন সংগ্রাম কিছু হচ্ছে। এগুলো যদি একদম না থাকত তা'হলে স্মৃতি থেকে সব দূর হয়ে যেতো, আমরা সব কিছুই ভুলে যেতাম, কিছুই করা সম্ভব হত না। এখানে বলা প্রয়োজন যে আমাদের সকল ব্যর্থতার দায় মাথায় নিয়ে শহীদ জননীকে এই বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ শরীরে রাস্তায় নামতে হয়েছে। এ লজ্জা কোথায় রাখি?

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমরা শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলি না। আমরা বলি "জাতীয় সত্তা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা" প্রতিষ্ঠা করার কথা। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও বড় ঘটনা হলেও মুক্তিযুদ্ধই সব কিছু না। আমাদের রয়েছে হাজার বছরের সংগ্রামের ঐতিহ্য। হাজার বছরের সংগ্রামের ফল মুক্তিযুদ্ধের মোহনায় এসে মিলিত হয়েছে। হাজার বছরের সংগ্রামের মাধ্যমে আজ আমরা মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠা করেছি। হাজার বছরের সেই সংগ্রামী ঐতিহ্যকে সেই চেতনাকে আমাদের ভুললে চলবে না। মুঘল আমলের পূর্বেও আমাদের বহু বীরসন্তান দিল্লির আগ্রাসন প্রতিহত করতে গিয়ে জীবন দিয়েছে। মুঘল আমলে ঈসা খাঁ, প্রতাপাদিত্য সহ বহু বীরদের সংগ্রাম, বৃটিশ আমলে ফকির সন্ন্যাস বিদ্রোহ থেকে শুরু করে সিপাহী বিদ্রোহ সহ বহু বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন সংগ্রাম, পাকিস্তান আমলেও বহু আন্দোলন সংগ্রামে আমরা অনেক রক্ত দিয়েছি, অনেক বীরত্ব গাঁথা ইতিহাস আমরা সৃষ্টি করেছি। এ সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি। আমাদের নিজেদেরকে চিনতে হলে সংগ্রামী ঐতিয্যে মন্ডিত হতে হলে সে সব স্মৃতিও ধরে রাখতে হবে। তার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের সত্তায় ওদের সুর বাজে। এসব জাতীয় বীরদের প্রতিকৃতি স্থাপন ও সংগ্রামের স্মৃতি রক্ষা করার ও জনমনে তা জাগরূক রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে। হাজার বছরের জাতীয় বীরদের ও তাদের সংগ্রামের স্মৃতি রক্ষা না করলে কিভাবে চিনব আমরা কারা, কিভাবে জানব আমরা কাদের উত্তরসুরী? আমাদেরকে ভবিষ্যৎ গড়ার অনুপ্রেরণা যোগাবে কে? এসব না করতে পারলে আমরা হীনম্মন্যতায় ভুগব। তাই আমরা বলি জাতীয় সত্তা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠা করার কথা।

www.pathagar.com

(১৩) আমরা নিজেরাই নিজেদের শৃঙ্খলে বন্দী

মানুষ নিজেই নিজের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় শত্রু

সমাজের শৃঙ্খল শুধু সমাজেই নিহিত নয়। আমরা আমাদের নিজের শৃঙ্খলে নিজেরাই আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। আমরা যদি আমাদের নিজেদের শৃঙ্খল ভাঙ্গতে না পারি তা'হলে সমাজের শৃঙ্খল ভাঙ্গা কোনভাবেই সম্ভব নয়। শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর শোষক শ্রেণী যখন দেখতে পায় যে, শুধুমাত্র অত্যাচার নিপীড়ন ও ভয়ভীতি দ্বারা ব্যাপক শোষিত মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, তখন তারা তাদের শোষণের স্বার্থে নানা ধরনের নীতিকথা শিক্ষা দেয়, অদৃশ্য শক্তির ভয়-ভীতি মানুষের মনে সৃষ্টি করে, যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস হারিয়ে ফেলে। আর জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে মানুষ নিজেই নিজের হাতে পায়ে শৃঙ্খল লাগিয়ে নেয়, শাসন শোষণের নিকট আত্মসমর্পণ করার মানসিকতায় তারা গড়ে উঠে। মানুষ নিজেই নিজের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। এভাবে তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্খা অবদমিত করা হয়। আমাদের সমাজে এ ধরনের অবস্থা ব্যাপকভাবে বিরাজমান। যার সবকিছু এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। মানসিকভাবে আমাদেরকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে এতো শোষিত হয়েও শোষণ মুক্তির কথা শুনতে গেলে শোষিতরাও অনেক ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধাচারণ ক'রে থাকে। আদর্শগতভাবে ও চিন্তা-চেতনায় স্বাধীন চেতনাবোধ প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে সামাজিক কাঠামো বদলানো সম্ভব নয়, অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এমনকি পরিবর্তন করলেও তা টিকিয়ে রাখা দুষ্কর হয়ে পড়ে। আদর্শগতভাবে স্বাধীন চেতনাবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই সমাজ ও জীবন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে এবং কি কারণে ও কিভাবে শোষিত হচ্ছি তা জানতে হবে। পুরানো ধারা ও অন্ধবিশ্বাস আমাদের চিন্তা-চেতনাকে অনবরত পিছু টানে। যেমন বিভিন্ন ধরনের পূজা, শাস্ত্রচর্চা, মোল্লাতন্ত্র, পীরপূজা, মাজার পূজা পুরানো নীতিবিদ্যা, ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবজ, মানত, জীন-ভূত চালান, চটাচালান, বাটিচালান, ভাগ্য গণনা, আয়না পড়া, চাল পড়া, ব্যক্তিপূজা, স্বামীপূজা, কঠোর পর্দাপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, বংশ মর্যাদা, ভূত-পেত্নি দেও-দানবের কাহিনী ও বিভিন্ন ধরনের পুরানো ভাবধারা মানুষের মুক্ত চিন্তায় বাধা সৃষ্টি করে, স্বাধীন চেতনাবোধকে আড়ষ্ট করে। এইসব অপসংস্কৃতিকে অবশ্যই উচ্ছেদ করতে হবে। স্বাধীন চেতনাবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হচ্ছে জনগণকে পুরানো ভাবধারার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা, বৃহৎ শক্তির পূজা-অর্চনা বন্ধ করা এবং এসব না করতে পারলে প্রগতিশীল নতুন সংস্কৃতি

www.pathagar.com

জন্ম লাভ করতে পারে না। আদর্শগতভাবে পুনর্গঠন বেশ কঠিন কাজ। মানুষের আদর্শ নির্ভর করে তার সামাজিক অর্থনৈতিক ও বস্তুগত জীবনের উপর। কিন্তু সামাজিক জীবনের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা ও বস্তুগত জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এটা আপনা-আপনি পরিবর্তিত হয় না। পুরানো ভাবধারা মানুষকে সবসময় পিছু টানে। দীর্ঘদিন ধরে জনমনে প্রোথিত প্রাচীন ভাবধারা অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং এগুলি অনেকদিন ধরে বাসা বেঁধে আছে। নিরবিচ্ছিন্ন আদর্শিক শিক্ষা ও শক্তিশালী আদর্শিক সংগ্রামের মাধ্যমে সাফল্যজনকভাবে এসব প্রাচীন ভাবধারার মূল উৎপাটন করা সম্ভব। দলের সদস্য ও কর্মজীবী জনগণের মন থেকে প্রাচীন ভাবধারার অবশেষগুলিকে দূর করার জন্য আমাদেরকে শক্তিশালী আদর্শিক সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।

(ক) রাজনীতিবীদ হচ্ছে সমাজের ডাক্তার

হাতুড়েদের চিকিৎসায় জাতি শেষ অবস্থায়

বিপ্লবী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হতে হলে ব্যাপক পড়াশোনা করতে হবে। পড়াশোনা ছাড়া বিপ্লবী সংগ্রামের সঠিক পথ বের করা সম্ভব নয়। পড়াশোনাকে প্রথম ও প্রধান কাজ হিসাবে জানতে হবে। একজন ডাক্তারকে যেমন চিকিৎসা করার পূর্বে রোগীর শরীর সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, জানতে হয় শরীরের কোথায় কি আছে, কোন অঙ্গ কিভাবে গঠিত হয়েছে, জানতে হয় রোগের উৎস কোথায়, নিরাময় কিসে তাও জানতে হয়, তেমনি একজন রাজনৈতিক নেতা বা কর্মী হচ্ছে সমাজের ডাক্তার। ডাক্তার যেমন মানুষের শরীরকে চিকিৎসা করে বা ভাল করে তেমনি একজন রাজনৈতিক নেতা বা কর্মী যিনি সমাজের ডাক্তার, সমাজ সম্পর্কে বিস্তারিত তাকে জানতে হয়, নইলে তার পক্ষে সমাজের চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। অনবরত ভুল চিকিৎসায় আমরা আজ মৃত্যুপথযাত্রী। সমাজ সম্পর্কে ব্যাপক লেখাপড়া ছাড়া (ডিগ্রিধারী জ্ঞানহীন নয়) অশিক্ষিত মূর্খদের হাতে এ পর্যন্ত দেশ পরিচালিত হাওয়ায় দেশের এই অবস্থা। দলের কর্মী বিশেষ করে দায়িত্বশীল কর্মীদের অনেক বেশি পড়ালেখা করতে হবে। জানতে হবে ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, সংস্কৃতি আর বিপ্লব সংগ্রামের নিয়ম কানুন ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে। আরো জানতে হবে আমাদের জনগণের রীতিনীতি ও মনমানসিকতা, জানতে হবে আমাদের মাটিকে, আমাদের ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে। জানতে হবে আমাদের কৃষিনীতি, শিল্পনীতি, বাণিজ্যনীতি, শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি। আরো জানতে হবে আমাদের সম্পদ ও তার ব্যবহারনীতি এবং স্বাধীন স্বনির্ভর দেশ গড়ার কলাকৌশল। আমাদের জানতে হবে উৎপাদন ব্যবস্থা ও সুষম বন্টননীতি সম্পর্কে। কিভাবে শোষণ করা হয়, শোষণের প্রক্রিয়া কি তা জানতে হবে। অর্থাৎ দেশ পরিচালনার সমস্ত বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সর্বোপরি দলীয় নীতি ও কর্মসূচী সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন ও তা অনুশীলন করতে হবে এবং তা'হলেই আমরা আমাদের স্বাধীন

www.pathagar.com

চেতনাবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে গণশাসন প্রতিষ্ঠা ক'রে সঠিক বাংলাদেশ প্রেমিক হতে পারবো। নিজের সম্পর্কে না জেনে জনগণের রীতিনীতি ও মনমানসিকতা না জেনে কেউ জনগণের আকাঙ্খা ও স্বার্থ অনুসারে কাজ করতে পারে না। নিজের দেশের ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মাটিকে না জেনে কৃষি ও শিল্পের বিকাশ ঘটানো যায় না। নিজের জনগণ ও সম্পদকে না জেনে শক্তিবৃদ্ধি করা যায় না। কাজেই নিজস্ব প্রচেষ্টা দ্বারা জনগণের স্বার্থ অনুসারে প্রভু হিসাবে নতুন সমাজ গড়তে হলে একজনকে অবশ্যই তার নিজের জিনিস সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হবে। নিজের সম্পর্কে না জেনে অপরের সম্পর্কে যত গভীর জ্ঞান অর্জন করাই যাক না কেন তা কোন কাজে আসে না। বরঞ্চ তা আরো সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের দেশের প্রগতিশীল রাজনীতির দাবীদারদের এ গুণ বহুল পরিমাণে বিদ্যমান এবং তার জন্য জাতিকে বহু খেসারত দিতে হয়েছে। অবশ্য এ কথা দ্বারা আমি এ বলছি না যে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করবো না। বিপ্লব ও বিনির্মাণে অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে অবশ্যই শিক্ষা নেয়া উচিৎ, তবে তা আমাদের দেশের সুনির্দিষ্ট বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খায় কিনা এবং আমাদের সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা সেটা যাচাই করে দেখা দরকার। সেটা যদি আমাদের পাকস্থলীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় কেবল তখনই সেটা আমরা গ্রহণ করবো নইলে তা ফেলে দিতে হবে।

(খ) আমরা এমনকি কোরিয়ান পন্থীও হতে পারি না

আমাদেরকে অবশ্যই পরাশ্রয়ীবাদ পরিহার করতে হবে। এরফলে আমাদের বহু ক্ষতি হয়েছে। মস্কো না মক্কা এ ধরনের শ্লোগানও শুনেছি। লেলিনগ্রাদ বা পিকিং-এ বৃষ্টি হলে বা মক্কায় রোদ উঠলে এখানে ছাতি ধরার গল্প আপনারা শুনেছেন। মস্কোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মস্কোওয়ালাদের যে কি দশা তা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা আমেরিকা পন্থী, ভারত পন্থী, পাকিস্তান পন্থী, চীনা পন্থী, রাশিয়ান পন্থী এ রকম কোন পন্থী হতে পারি না। এমন কি কোরিয়ান পন্থীও হতে পারি না। আগেই বলেছি পদ্মার ঢেউয়ের সঙ্গে যেমন কোরিয়ার ট্রেডং নদীর ঢেউয়ের পার্থক্য রয়েছে তেমনি আমাদের চলার পথেরও পার্থক্য রয়েছে। সেকারণে আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের নিজ পন্থী অর্থাৎ বাংলাদেশ পন্থী হতে হবে। আমেরিকাই বলুন আর কোরিয়াই বলুন কেউ আমাদের সমস্যার সমাধান ক'রে দেবে না। আমাদের সমস্যার সমাধান আমাদের নিজেদেরকেই করতে হবে। তবে ঐ দেশগুলোর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি আমাদের মতো দেশগুলিতে আন্তর্জাতিক শোষণ দৃঢ় করার মাধ্যমে আমাদের সম্পদে স্ফীত হতে চায়, ওরা চায় আমাদের উপর ওদের আধিপত্য বজায় রাখতে। আর উত্তর কোরিয়ার মতো সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি চায় সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও বলয় থেকে আমাদের মতো দেশগুলি মুক্তি পাক, নিজের পা'য়ে এরা নিজেরা দাঁড়াক।

www.pathagar.com

(১৪) পিপলস্ লীগ একটি ব্যতিক্রমধর্মী রাজনৈতিক দল

গণশাসন এক ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচী

আগেই বলেছি এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে পিপলস্ লীগ একটি ব্যতিক্রমধর্মী দল। পিপলস্ লীগ একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন যার এ দেশের বাস্তবতার সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি নিজস্ব তাত্ত্বিক লাইন রয়েছে। একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী রয়েছে, নিজস্ব দর্শন রয়েছে। পিপলস্ লীগ সমাজ পরিবর্তনের ফরমুলা দিয়েছে। আমরা গণশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি নতুন সমাজ গড়তে চাই। এই নতুন সমাজ গড়তে না পারলে একদিকে যেমন সত্যিকারভাবে স্বাধীন জাতি হিসাবে আমাদের দাঁড়াবার রাস্তা থাকবে না। অন্যদিকে আমাদের ক্ষুধার্ত, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত মৃত্যুমুখি জনগণকে বাঁচাবারও কোন পথ থাকবে না। আমরা বিশ্বাস করি বর্তমান কাঠামোর পরিবর্তন ক'রে যদি আমরা গণশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারি তা'হলে আমরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকার অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারব। তাদের উন্নত সাংস্কৃতিক জীবনের ব্যবস্থা করতে পারব। শোষণ, নিষ্পেষণ থেকে জনগণকে মুক্তি দিতে পারব। পিপলস্ লীগ তার জন্মলগ্ন থেকেই স্বাধীন স্বনির্ভর দেশ গড়ার এবং জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের কথা বলে আসছে। যার জন্য অনেকেই আমাদেরকে 'ইকোনোমিক' পার্টি বলে ঠাট্টা ক'রে থাকে। আসলেই আমরা জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম ক'রে আসছি। অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া একটি দেশের ও তার জনগণের রাজনৈতিক অধিকার এবং নাগরিক অধিকার নিশ্চিত হয় না, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না। তথাকথিত পশ্চিমা গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে যে এর কোন অর্থনৈতিক কর্মসূচী নেই। যা আছে তা হচ্ছে এটা বিত্তবানদের আরো স্ফীত করে, বিত্তহীনদের নিঃশেষ করে, সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে তীব্র করে। একজন নিরন্ন ব্যক্তির কাছে গণতন্ত্র মূল্যহীন। গণতন্ত্র তখনই পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে যখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়।

আগেই বলেছি গণশাসন প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে এক ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচী। গণশাসন শ্রমজীবী, কর্মজীবী মানুষের আশা-আকাঙ্খা পূরণের কর্মসূচী; স্বাধীন স্বনির্ভর দেশ গড়ার কর্মসূচী; মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক মুক্তির কর্মসূচী। এদেশের মানুষের সংগ্রামী ঐতিহ্য ও সম্পদের কথা আগেই বলেছি। আমাদের যে সম্পদ আছে এবং সংগ্রামের যে ঐতিহ্য আছে তা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয় সে সম্পর্কেও আগেই বলেছি।

www.pathagar.com

(ক) দুই বৎসরের মধ্যে দেশ গড়া কল্পনাবিলাসী কোন চিন্তা নয়

আগেই বলেছি সঠিক কর্মসূচী গ্রহণ করলে আমাদের সমস্ত লোকের কর্মসংস্থান তথা খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে, প্রতিটি লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে, নূন্যতম চিকিৎসার সুযোগ প্রদান করতে এবং অন্তত ৬০ বৎসর পর্যন্ত বয়সী সমস্ত লোককে নূন্যতম শিক্ষা প্রদান করতে এবং পুরো জাতিকে দেশরক্ষায় সক্ষম ক'রে গড়ে তুলতে দুই বৎসরের বেশি সময় লাগার কথা নয়। এটা আমি গায়ের জোরে বলছি না। এটা আমাদের কল্পনাবিলাসী কোন চিন্তা নয়। শুধু কোরিয়া নয়, চীনের সমাজ ব্যবস্থাও ভালভাবে নিরীক্ষণ ক'রে সেখানকার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও বৈঠক ক'রে কোরিয়া ও চীনের অভিজ্ঞতা নিয়ে এবং একই সঙ্গে কিছু উন্নয়নশীল দেশের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ক'রে যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তার থেকে এবং আমাদের দেশের বাস্তবতা ও সব কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই আমি সাহসের সাথে এসব কথা বলছি। ঐ সমস্ত দেশগুলিও অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাদের মূল সমস্যার সমাধান করেছে। কিন্তু তারা যে অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল আমরা তারচেয়ে অনেক বেশি সুবিধাজনক স্থানে রয়েছি। কোরিয়ায় অনেক বিশেষজ্ঞ ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমার অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। তাঁদের কয়েকজন গণশাসন বইটির ইংরেজী অনুবাদ পড়ে বলেছেন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রত্যেকের এ ধরনের নিজস্ব নীতি, আদর্শ ও কর্মসূচী নির্ধারণ করা উচিৎ। তাঁরা আরো বলেছেন যে, তাঁরা নিজেরাও জুচে ভাবধারার ভিত্তিতে এ ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের অভিজ্ঞতায় তাঁরা মনে করেন যে গণশাসন এর কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে পারলে তাঁদের মতো আমাদের দেশেও অতি অল্প সময়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে। তাঁরা আরো বলেছেন কোরিয়ার অভিজ্ঞতা সামনে রেখে অন্যের দেশ গড়ার ক্ষেত্রে নিজস্ব পথ তৈরি করতে গণশাসন বইটি মডেল হিসেবে কাজ করতে পারে। সেকারনে বইটি তাঁরা অন্য দেশের লোকদের পড়তে দিবেন।

•

www.pathagar.com

(১৫) নীতি ও আদর্শ প্রণয়নই শেষ কথা নয়

নীতি ও আদর্শ প্রণয়নই শেষ কথা নয়। ভাল তত্ত্বকথা বা নীতি ও আদর্শ যদি বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে রইল তা'হলে এর কোন মূল্য নেই। এটার বাস্তবায়নই সবচেয়ে বড় কথা। কাজেই গণশাসন প্রতিষ্ঠার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং এর দায়িত্ব আমাদের সবার। যাদের জন্য নীতি ও আদর্শ তাদেরকে যদি এ ব্যাপারে সচেতন ও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা না যায় তা'হলে গণশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। মনে রাখবেন সকল কর্মসূচীই শেষ পর্যন্ত জনগণ বাস্তবায়িত করে। সে কারণে জনগণ যখন সঠিক নীতি কর্মসূচী ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে পারে তখন তারা তা উদ্যমের সাথে গ্রহণ ক'রে বাস্তবায়িত করতে পারে। জনগণের শক্তি নির্ভর করে তাদের ঐক্যের উপর। যখন তারা ঐক্যবদ্ধ হয় তখন তারা বিপ্লবী সংগ্রামে বিস্ময়কর ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে।

(ক) প্রগতিশীল চিন্তার মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বের বিকল্প নেই এই মুহূর্তে

আমাদের দলের মনোগ্রামে আছে কৃষকের কাস্তে, শ্রমিকের হাতুড়ী এবং বুদ্ধিজীবীদের কলম। কৃষক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয় ঘটাতে না পারলে ব্যাপক কিছু করা সম্ভব নয়। বুদ্ধিজীবীদের দোদুল্যমান চরিত্র রয়েছে। অনেকক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিক্রিয়াশীল। তবে একই সঙ্গে প্রগতিশীল চিন্তার বুদ্ধিজীবীও রয়েছে। একজন বুদ্ধিজীবী যদি সমাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা পোষণ করে তা'হলে তার দৃষ্টিভঙ্গি শোষিত শ্রেণীর পক্ষে যেতে বাধ্য। আমাদের মতো দেশে যেখানে বিপ্লব সংগ্রামে নেতৃত্ব দানকারী শ্রমজীবী শ্রেণী অত্যন্ত দুর্বল, বিপ্লব সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়ার মতো এখনো তাদেরকে দক্ষ ক'রে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি এবং সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক নিপীড়িত সামন্তবাদ প্রধান কাঠামোর দেশে এটাই স্বাভাবিক, সেখানে প্রগতিশীল আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানের মূল দায়িত্ব হচ্ছে মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী হতে আগত প্রগতিশীল আদর্শের অনুসারী ব্যক্তিগণের এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাদের নেতৃত্ব ছাড়া শ্রমজীবী মানুষকে সচেতন ও নেতৃত্ব গ্রহণ করার মতো উপযুক্ত ক'রে গড়ে তোলা বা বিপ্লব সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এবং এটাই বাস্তবতা।

www.pathagar.com

(খ) গণ-আন্দোলন ছাড়া ক্ষমতা দখলের বিকল্প নেই

গণ-আন্দোলন হচ্ছে জনগণকে সংগঠিত করার একটি উত্তম পন্থা। এটি হচ্ছে জনগণের সম্মিলিত শক্তির উপর নির্ভর ক'রে বিপ্লব ও বিনির্মাণকে ত্বরান্বিত করার কর্মপদ্ধতি। একটি গণ-আন্দোলন জনগণের বিপ্লবী চেতনাকে শাণিত করে। তাদের সংহতি ও সহযোগিতাকে জোরদার করে। গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে গণ-সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারলে ক্ষমতা গ্রহণের রাস্তা জনগণই ঠিক ক'রে নেয়। জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত না ক'রে অনেকেই বিপ্লবী কর্মসূচী নিয়ে বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। অস্ত্র হাতে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখেছিলেন। রাশিয়া, চীন, কোরিয়ার মতো বিপ্লব করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশের বাস্তবতা, মানুষের মন-মানসিকতা, চিন্তাধারা এবং ভৌগলিক অবস্থার কথা তারা বিবেচনা করেনি। আমাদের নিজস্ব সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকেও তারা শিক্ষা নেয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা জনগণ থেকে শুধু বিচ্ছিন্নই হয়নি নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আমাদের নিজস্ব বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতা সামনে রেখে কাজ করলে এ অবস্থা হতো না। আমাদের জনগণকে যখনই ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে তথা গণ-আন্দোলনে তাদেরকে নামানো সম্ভব হয়েছে তখন তারা অসাধ্য সাধন করেছে। আয়ুব খানের মতো লৌহ মানব গণ-আন্দোলনের সামনে ধরাশায়ী হয়েছে। এরশাদ গণ-আন্দোলনের সামনে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। শোষক শ্রেণী গণ-আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য পুলিশ, বি ডি আর এবং আর্মির মতো নিপীড়নকারী বাহিনীকে নামিয়ে দেয়। কিন্তু জনগণ বুকের রক্ত ঢেলে এসবের প্রতিহত করে। কিন্তু সে নিপীড়ন যদি চরম অবস্থায় যায় তখন জনগণও বসে থাকে না। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্ব শান্তিপূর্ণ গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনের তাগিদে এমনকি নেতৃত্বের হুকুমের দিকেও তাকিয়ে না থেকেতারা নিজেরাই অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে অস্ত্রের জবাব অস্ত্র দিয়েই দিয়েছিল। আর এখনকার বাস্তবতা সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছে। এখন আর পশ্চিমা আর্মি পুলিশ নেই। আমাদের ছেলেরাই আজ সেখানে। ওরা সবাই আমাদের কৃষক শ্রমিকের সন্তান। আন্দোলনের একটি পর্যায়ে এরশাদের হুকুম ওরা অমান্য ক'রে আর গুলি চালায়নি। ফলে এরশাদের পতন ত্বরান্বিত হয়েছে। আর আমরা যেখানে কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের মুক্তির কথা বলছি; তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক মুক্তির জন্য গণ-আন্দোলনের কথা বলছি; শাসনতন্ত্রে প্রতিটি নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গণ-আন্দোলনের কথা বলছি সেখানে আমার কৃষক শ্রমিকের ছেলেরা কতক্ষণ আর ওদের হুকুম পালন করবে। তাছাড়া সঠিক ভাবে গণ-আন্দোলন

www.pathagar.com

এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে সেক্ষেত্রে নির্বাচনে অংশগ্রহণ ক'রেও বিপ্লব সমাধা করা যায়। যেমন ৬৯/৭০ সালের গণ-আন্দোলনের এক পর্যায়ে যে নির্বাচন হয়েছিল সে নির্বাচনের ফলাফল ছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতার বিপ্লব।

(গ) গণ-আন্দোলন সংগঠিত করতে হলে কি করণীয়

গরীব ও স্কুলে যাওয়ায় অক্ষমরাই দেশের জন্য বেশি জীবন দিয়েছে

গণ-আন্দোলন সংগঠিত করতে হলে দলীয় কর্মীদের ব্যাপকভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে হবে। ঢাকা শহরের আশেপাশেই বিশ লক্ষ বস্তিবাসী আছে। ওদেরকে জানাতে হবে আমরাই একমাত্র দল যারা সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে প্রত্যেকের বাসস্থান সংস্থানের ব্যবস্থা করতে দায়িত্ব নিতে পারি। রিক্সাওয়ালাদেরকে জানাতে হবে ওদের মুক্তির নিশ্চয়তা আমরা দিতে পারি। শ্রমজীবী কর্মজীবী মানুষকে সমাজ পরিবর্তনের নেতৃত্ব গ্রহণের আহবান জানাতে হবে। কৃষকদেরকে তাদের মুক্তির সংগ্রামে টেনে আনতে হবে। ছাত্র যুবক ও মহিলা সমাজকে আমাদের মুক্তির সংগ্রামে নামাতে হবে। শিল্পপতি ব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবীসহ সকল পেশার মানুষের নিকট আমাদের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। ওদের জানাতে হবে যে একমাত্র আমরাই গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারি। আমরাই একমাত্র দল যারা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে পারি। শাসনতান্ত্রিক ভাবে প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের দায়িত্ব নিতে পারি। স্বাধীন স্বনির্ভর দেশ গড়ে তুলতে পারি। জাতীয় সত্তা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠা করতে পারি। দেশকে রক্ষা করার মতো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়তে পারি। ইতিপূর্বে এসব বিষয়ে মোটামুটি আলোকপাত করেছি।

মনে রাখবেন, মানুষের যাতে প্রয়োজন ও স্বার্থ পূরণ না হয় তাতে মানুষ সাড়া দেয় না। এটাই মানুষের ধর্ম। বস্তুজগতের যা কিছুতে মানুষের দাবী ও স্বার্থ পূরণ হয় তার দিকেই মানুষ ছুটে যায়। বড় বড় দলগুলির প্রতি মানুষ ছোটে, যদিও তারা জানে যে এসব দলের কেউই তাদের মুক্তি নিশ্চিত করতে পারবে না, তাদের ভাগ্য যেখানে আছে সেখানেই থাকবে, নেতাদের শুধু ভাগ্যের পরিবর্তন হবে। এসব বড় দলের কারো উপরই জনগণের আস্থা নেই। তথাপি তারা কেন এসব দলের পিছনে ছোটে? কারণ তাদের আকাঙ্খা পূরণ করার মতো কোন বিকল্প শক্তি নেই, এ ধরনের কোন নীতি কেউ নির্ধারণ করেনি। তারা যায় হয় দশ/বিশ টাকা পাবার জন্য—একই ব্যক্তি একেকদিন

www.pathagar.com

একেক দলের সভায় যায় —না হয় যায় চাপ ও ভয়ভীতির কারণে। অন্যেরা যায় ভবিষ্যতের আশায়—নেতারা মোটা তাজা হলে ওদের ভাগ্যেও কিছু হাড়গোড় পড়বে এই আশায়। আর এক শ্রেণীর লোক যায় বড় দলের সাথে থাকার মাধ্যমে সমাজের উপর তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য। এসব দল তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন করতে পারে না জেনেও মানুষ যখন তাদের সঙ্গে যায় সেখানে যখন আমাদের হাতে ওদের দাবী ও স্বার্থ পূরণের কর্মসূচী রয়েছে, ওদের ভাগ্য পরিবর্তনের রাস্তা রয়েছে তখন তারা কেন আমাদের সঙ্গে আসবে না। নিশ্চয়ই তারা আসবে। শুধু যদি ওদের দাবী ও স্বার্থ সম্পর্কে সঠিকভাবে আমরা ওদেরকে বোঝাতে সক্ষম হই এবং দলীয় সংগঠনকে গতিশীল ক'রে তুলতে পারি তা'হলে অবশ্যই জনগণ আমাদের সঙ্গে আসবে। আমাদের দলীয় কর্মীদের এ ব্যাপারে নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সমস্ত কিছুর ওপরে আমাদের দলীয় কর্মকান্ডকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ব্যাপক পড়াশোনা ও শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদেরকে নতুন সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ক'রে গড়ে তুলতে হবে। অন্যদিকে ব্যাপক জনগণকে সংগঠিত করার কাজে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। দেশকে ভালবেসে জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন করার মত মহৎ কাজ দুনিয়ায় আর কিছু নেই। দেশ এবং জাতিকে ভালবেসে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ যেখানে অকাতরে নিজের জীবন দান করছে সেখানে আমরা কিছুই করব না শুধু নিজেদের আরাম-আয়েশ-বিলাসের কথা চিন্তা করব তা হতে পারে না। যারা এটা করে তাদের সঙ্গে গরু ছাগল-জীবজন্তুর কোন পার্থক্য নেই। স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা শেষ পর্যন্ত নিজেরও কোন উপকার করে না সমাজেরও কোন উপকার করে না, বরঞ্চ ক্ষতিই করে। মানুষ সামাজিক জীবন যাপন করে বলেই সে মানুষ। সেই সামাজকেই যে অস্বীকার ক'রে নিজের স্বার্থ দেখতে গিয়ে সমাজের প্রতি কোন দায়িত্ব পালন করে না, সে কি আর মানুষ থাকে। যারা দেশকে ভালবাসে তারা দেশপ্রেমিক এবং যাদের দেশ ও সমাজ সম্পর্কে কোন চিন্তা নেই শুধু নিজের আরাম-আয়েশের কথা চিন্তা করে তারা দেশপ্রেমিকতো নয়ই বরং তারা বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী এবং সমাজের শত্রু। মনে রাখবেন, দেশ ও জাতি যদি না বাঁচে, জনগণ যদি না বাঁচে তবে যত চেষ্টাই করুন না কেন কেউ বাঁচতে পারবেন না। দেশকে যারা ভালবাসে, জনগণকে যারা ভালবাসে তারা জনগণের হৃদয়ে অমর হয়ে থাকে। তাদের বীরত্ব গাঁথার কথা মানুষের মুখে মুখে ফেরে। ভবিষ্যতের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকে তারা। শোষকদের কথা হয় কেউ মনে রাখে না, নয় ঘৃণাভরে স্মরণ করে। আপনি কতটুকু শিক্ষিত এই অর্থে যে আপনার কত ডিগ্রি আছে সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে আপনি সমাজের জন্য কতটুকু করলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, দুনিয়ার বেশিরভাগ গরীব ও স্কুলে যাওয়ায় অক্ষম ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই বেশি সংখ্যক দেশপ্রেমিক এসেছে, এরাই বেশি জীবন দিয়েছে। বৃটিশ ও পাকিস্তানীদের তাবেদারী আমাদের শিক্ষিত সমাজ যে

www.pathagar.com

পরিমাণে করছে আমাদের অশিক্ষিতরা তা করলে আজও আমরা গোলামীর জিঞ্জির পরেই থাকতাম। আমাদের বেশীর ভাগ শিক্ষিত ও ধনী লোকেরা এমন স্বার্থপর ও অসচেতন আচরণ করে যে তাদেরকে মানুষ বলে কল্পনা করাও দায় হয়ে পড়ে। জীবজন্তুর মধ্যে যে সহমর্মিতা আছে তাদের তাও নেই।

(ঘ) আত্মদানে প্রস্তুত দশজন মানুষ চাই

গণশাসনের নতুন সমাজ গড়তে আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আমাদের দৃঢ়প্রত্যয়। আমরা যারা এই বই পড়ছি সেই কয়জনই যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই তা'হলে আমরাই সেই সংগ্রামের যাত্রা শুরু করতে পারি। বড় বড় মনীষীরা বলেছেন দশজন লোকও যদি একটি দেশে বিপ্লব সংগ্রামের জন্য আত্মদানে প্রস্তুত থাকে তবে ঐ দেশে বিপ্লব সংগ্রাম কেউ রুখতে পারে না। তাঁরা আরো বলেছেন যে, একটি দেশের শতকরা ১ ভাগ লোকও যদি বিপ্লব সংগ্রামের পক্ষে থাকে তা'হলে ঐ দেশে বিপ্লব সংগঠিত হয়। এ কথার বহু প্রমাণও রয়েছে। কাজেই আমাদের নিজেদেরকে হীন ভাবলে চলবে না। আমরা ১ জন ১০ জন কর্মী তৈরি করব, ১০ জন ১০০ জন কর্মী তৈরি করব এই কর্মপন্থা গ্রহণ ক'রে আসুন আমরা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে যাত্রা শুরু করি। আমাদের হাতে রয়েছে গণশাসন এর তাত্ত্বিক অস্ত্র। আমাদের রয়েছে জনগণকে শাসন শোষণ নির্যাতন থেকে মুক্ত ক'রে সুন্দর এক দেশ গড়ার কর্মসূচী। আমাদের হাতে রয়েছে জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরণের কর্মসূচী। আমাদের রয়েছে শাসনতন্ত্রে প্রতিটি নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার অধিকার প্রদানের কর্মসূচী। আসুন আমরা সবাই মিলে সে কর্মসূচী বাস্তবায়িত ক'রে এক নতুন দেশ গড়ে তুলি।

এতক্ষণ আমি আমাদের চিন্তা চেতনা ও কর্মসূচী নিয়ে যতটা সম্ভব আলোচনা করলাম। যদিও সব কথা খোলাখুলি বলার সময় আসেনি। সময় আসলে আরও খোলাখুলিভাবে অনেক কথাই বলা হবে।

গণশাসন প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী সংগ্রামে আমরা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দৃঢ়প্রত্যয়ে এগিয়ে যাব এই আশাবাদ ব্যক্ত ক'রে এ লিখা শেষ করার আগে আপনার কাছে একটি অনুরোধ রেখে যাচ্ছি। তা হচ্ছে, আপনি আজ রাত্রে ঘুমাবার আগে একবার চিন্তা করবেন, ''আমি কি দেশের জন্য, জনগণের জন্য কিছু করতে পারি? আমার কি কিছু করার আছে? আমার কি কিছু করা উচিৎ? আমি কি কিছু করব? কিভাবে করব?"

বিঃ দ্রঃ এই বইয়ের বিষয়বস্তু ও বক্তব্য সম্পর্কে আপনার অভিমত প্রকাশকের ঠিকানায় জানানোর অনুরোধ জানাচ্ছি— লেখক।

— শেষ —

www.pathagar.com